অকালবোধন ও আমাদের শারদোৎসব

- পূর্ণিমা ঘোষ

"যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।..."

শরৎ এলেই বেজে ওঠে শারদ উৎসবের বাজনা। মেতে ওঠে গোটা ভারতবর্ষ শক্তির আরাধনায় যার কেন্দ্র বিন্দুতে রয়েছেন যিনি তিনিই স্বয়ং মা দুর্গা; মহাজাগতিক আদি শক্তির আধার। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণা। জগৎ সংসারে ছোটো বড়ো নির্বিশেষে সবাইকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার অঙ্গীকারে তিনি অবিচল।

এ ধরাধামে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বিশেষ প্রয়োজনে। মহাবিশ্বকে পরাক্রমশালী অশুভ শক্তি মহিষাসুরের কবল থেকে রক্ষা করে শান্তি ফিরিয়ে আনতে; অসত্য অশুভ শক্তিকে পরাজিত করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে।

শারদোৎসব বস্তুতপক্ষে তাই দুর্গাকে ঘিরেই উৎসব বা দুর্গোৎসব। মহিষাসুরের সঙ্গে লড়াইয়ে মা দুর্গার সাফল্যের উদযাপন।

দুর্গোৎসবের জন্যে অবশ্য গোড়ায় শরতকালকে বেছে নেওয়া হয় নি; বেছে নেওয়া হয়েছিল বসন্তকালকে। কেন না, শাস্ত্রমতে শরতকালই হোল দেবলোকে বিশ্রামের সময় বা ঘুমোনোর সময়। ভগবান বিষ্ণু, যাঁর উপরে রয়েছে সারা বিশ্ব সংসারের পালনের দায়িত্ব তিনি নিজেই এ সময় থাকেন বিনিদ্রিত।

ত্রেতা যুগে শ্রীরামচন্দ্র রাবণের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় মা দুর্গার আশীর্বাদ লাভের জন্যে এ নিয়ম ভঙ্গ করেছিলেন; সীতা উদ্ধারের জন্যে মা দুর্গার অকালবোধন করেছিলেন শরতকালে। তাতে মা দুর্গা মোটেও অপ্রসন্ন হন নি। সংবেদনশীল মায়ের মন, সন্তানের জন্য দায়িত্ব পালনে তিনি যে সর্বদাই সজাগ। বিশ্রামের সময়েও তাই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন করুণাময়ী মা। মা দুর্গার আশীর্বাদে ধন্য হয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। যথার্থ অর্থে তিনি সদাই প্রসন্নময়ী। তিনি দুর্গতিনাশিনী।

ভারতবর্ষে শারদীয় উৎসব হিসাবে মায়ের পুজোর আয়োজন হয় সব রাজ্যে, রামচন্দ্রের নিয়ম ভাঙ্গা নিয়ম মেনে। সাড়ম্বরে আয়োজন করে মায়ের অকালবোধনের। তবে স্থান আর পরিবেশের ভিন্নতায় পার্থক্য চোখে পড়ে পুজোর পদ্ধতিতে ও প্রতিমা বিন্যাসে। যেমন গুজরাতে মায়ের আরাধনা করা হয় সিংহবাহিনী অম্বাবাই রূপে। দক্ষিণ ভারতে মায়ের আরাধনা করা হয় আয়ুধ পুজোর ভিতর দিয়ে। আর আমাদের বাংলায় তিনি পূজিত হন তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সিংহ বাহিনী মহিষাসুরমর্দিনী দশভুজা মা দুর্গা রূপে।

"জাগো, তুমি জাগো,
জাগো দুর্গা, জাগো দশ প্রহরণ ধারিণী,
অভয়া শক্তি বল প্রদায়িনী,
তুমি জাগো।

প্রণমি বরদা অজরা অতুলা
বহু বল ধারিণী রিপুদল বারিনী জাগো মা।
শরণময়ী চন্ডিকা শঙ্করী জাগো ,জাগো মা,
জাগো অসুর বিনাশিনী তুমি জাগো। "

বাঙালীর শক্তি আরাধনা অবশ্য এখানেই থেমে থাকে না। বাঙালীর সাবলীল প্রার্থনায় ও ভক্তির আবেগে মা দুর্গার মনকে নাড়া দেয়। বাঙালীর অনুভূতিতে তিনি দেবালোক থেকে হাজির হন মানুষের ধরা ছোঁয়ার সীমানায়। বাঙালী মনের দুয়ার ঠেলে ঢুকে পড়েন অবলীলায় হৃদয় মাঝে। ঐশ্বর্যশালিনী সর্বজন পূজ্যা মা দুর্গা হয়ে ওঠেন কাছের মানুষ, বাঙালী ঘরের আদরের মেয়ে 'উমা'। তাই বাঙালী হৃদয় গেয়ে ওঠে শারদ প্রাতে -

"যাও যাও গিরি আনতে গৌরী
উমা আমার নাকি কেঁদেছে।.. "

ভক্তি আর ভালোবাসায় সিক্ত আগমনী ও বিজয়া গানে অনুরণন জাগে আকাশে আর বাতাসে। ছন্দে ও কথায় মা দুর্গার সাথে চলে সরাসরি ভাব বিনিময়, চলে সংসারের সুখ দুঃখের গল্প পুজোর দিনগুলোতে। পুজো মণ্ডপে আর মন্দিরে মানুষের ঢল নামে। মা দুর্গাকে ঘিরে সবার মিলনে বাঙালীর দুর্গোৎসব পরিপূর্ণ হয় আপন মহিমায়।

আমাদের টোকিওতেও আমরা এক দিনের দুর্গা পুজোয় মেতে ওঠি। আমরাও সমবেত হই বাংলার সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা মেনে দেবীর আরাধনায়।

"ওঁ চণ্ডীকে! চল চল চালয় চালয় দুর্গে !
পূজা আলয়াং প্রবিশ। ---"

আমরাও ভক্তি আর শ্রদ্ধার নৈবেদ্য সাজিয়ে অঞ্জলি দিই। প্রার্থনা জানাই। প্রণাম জানাই দুর্গতিনাশিনী স্নেহময়ী মাকে, আমাদের টোকিওর শারদোৎসবের ভিতর দিয়ে।

"ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে, সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে, ত্র্যম্বকে গৌরী, নারায়ণী নমোহস্তু তে॥--"

মনিপুরী নাচের প্রতি আমার শ্রদ্ধা

- সেৎসু তোগাওয়া

মনিপুর ভারতবর্ষের উত্তরপূর্বে ব্রহ্মদেশের সীমান্তে অবস্থিত ছোট্ট একটি রাজ্য। মনিপুর তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতির জন্য বিখ্যাত। মনিপুর বলতে অধিকাংশ লোকের নয়নমুগ্ধকর মনিপুরী নৃত্য সম্বন্ধে ধারণা আছে, কারণ প্রথম দিকে ভারতবর্ষের চারটি প্রধান নৃত্যশৈলীর মধ্যে মনিপুরী ছিল অন্যতম। কিন্তু নৃত্য ছাড়াও মনিপুরের তাঁতের কাজ, সেলাই, বাঁশের কাজ, কারুশিল্প, সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্র, মার্শাল আর্ট, এসকল শিল্প ও সংস্কৃতিও অসাধারণ। এখানে নাচকে কেন্দ্র ক'রে মনিপুর সম্পর্কে আমার কিছু অভিজ্ঞতা, অনুভূতির কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি।

আমি যেহেতু শান্তিনিকেতনে মানুষ হয়েছি, ছোটবেলা থেকেই স্কুলে নৃত্যশিক্ষা শুরু হয়েছে। যেহেতু নাচতে ভালবাসতাম আর সারা বছর নানা অনুষ্ঠানে ডাক পেতাম, তাই স্কুলের বাইরেও নাচ শেখার সুযোগ হয়েছিল। স্কুলে পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে নিয়মিত নাচ, গানকে রাখা, এটা শান্তিনিকেতনের বৈশিষ্ট্য। কারণ গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখাপড়ার পাশাপাশি নৃত্য-সঙ্গীত, চিত্রকলা, শিল্পকলাকে সমান গুরুত্ব দিয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনে বিদ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার সূচনা থেকে ছেলেমেয়েদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যবহারিক লেখাপড়া ও শিক্ষার সাথে সাথে সাংস্কৃতিক চর্চা ও তার অনুশীলনকে আবশ্যিক বলে মনে করেছিলেন। ১৯১৯ সালে গুরুদেব যখন আসামের সিলেটে (বর্তমান বাংলাদেশ) যান, তখন তাঁকে অতিথিরূপে বরণ করার জন্য গ্রামের মেয়েরা মনিপুরী নৃত্য পরিবেশন করে। সেই সময় দেখা মনিপুরী নৃত্য গুরুদেবের মনে গভীর রেখাপাত করে, এবং তিনি অনুভব করেন যে মনিপুরী নৃত্যকলা আয়ত্ত করতে হলে নিয়মিত ও ধারাবাহিক নৃত্য অনুশীলন প্রয়োজন। গুরুদেব যখন যেটা ভাল লেগেছে তখনই সেটা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছেন। তাই শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের নৃত্যশিক্ষা দানের জন্য তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ত্রিপুরার মহারাজের সহায়তায় মনিপুরী নৃত্যের গুরুকে আমন্ত্রণ জানান। প্রথমে শরীরচর্চা নামে ছেলেদের মাধ্যমে শিক্ষা শুরু হলেও ক্রমশঃ মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। এইভাবে শান্তিনিকেতনে প্রথম মনিপুরী ধ্রুপদী নৃত্যশিক্ষার সূচনা হয়েছিল। আমার মনে হয়, ১৯১৬ সালে গুরুদেব প্রথম জাপানে এসে জাপানি নৃত্যে যে আত্মনিবেদনের ভাব দেখেছিলেন, তারই অনুরূপ আবেগময়তা যেন তিনি ভারতীয় মনিপুরী নৃত্যে খুঁজে পেয়েছিলেন।

এবারে মনিপুরী নাচ নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতার কথা লিখছি। জাপানে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ ক'রে আমি যখন আবার শান্তিনিকেতনে ফিরে যাই, আমার মনে নাচ শেখার আগ্রহ জাগে। তখন ২ বছরের সার্টিফিকেট কোর্সে মনিপুরী নাচ শেখার সুযোগ হয়। মনিপুর থেকে আগত নৃত্যগুরু মনিপুরী নৃত্যের প্রাথমিক স্টেপ থেকে শুরু ক'রে মাথা, হাত, আঙুল, কব্জি, কাঁধ, পা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিভিন্ন exercise নিখুঁতভাবে শিখিয়েছিলেন। কিছু কিছু ছোটবেলায় শেখা জিনিস হলেও, এবারে আমার অনুভূতি একদম অন্যরকম ছিল। দু'বছরের মধ্যে আমি মনিপুরী নাচের ভক্ত হয়ে গেলাম। আমার মনে তখন আরও শেখার, মনিপুরী নৃত্য-জগতের আরও গভীরে প্রবেশ করার প্রবল ইচ্ছা হোল। মনিপুরে সহজে যেতে পারলে আমি হয়তো সোজা মনিপুরেই চলে যেতাম, কিন্তু তখন বিদেশী পাসপোর্টধারীদের মনিপুরের মত সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে প্রবেশ করা নিষেধ ছিল। ICCR ও আমাকে বাধা দিলো। আমি শান্তিনিকেতনেই ধারাবাহিকভাবে শিখতে লাগলাম।

ইতিমধ্যে বাবা বিশ্বভারতীর জাপানি বিভাগ থেকে অবসর নেওয়ার ঠিক পরে মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রণ পান জাপানি ভাষা পড়াবার জন্য। প্রথমে বাবা একা গিয়েছিলেন। মা'ও কয়েকবার সঙ্গ দিয়েছেন। আবার মনিপুরী নাচ শিখতে শুরু করায় আমিও না গিয়ে থাকতে পারলাম না। আমার পক্ষে এই সুযোগটা ঈশ্বর-দত্ত আশীর্বাদের মত ছিল। প্রত্যেক বছরই নানান কাগজপত্র জমা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মনিপুর রাজ্যে প্রবেশের অনুমতি পাওয়াটা অনিশ্চিত ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বাবা মনিপুরে পড়াতে যেতে আনন্দ পেতেন আর আমিও আমার পক্ষে তীর্থস্থান মনিপুরে যাওয়ার জন্য সব সময় মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। সকালে বাবার ক্লাশে সাহায্য করতাম, আর দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পরে যেতাম আমার নাচের ক্লাশে।

মনিপুরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গেষ্টহাউসে থাকতাম। মনিপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজধানী ইম্ফল থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দূরে কাঞ্চিপুর নামে এক ঐতিহাসিক স্থানে অবস্থিত। সেখানে এক সময় রাজপ্রাসাদ ছিল। তাই এখনও বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে কিছু ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। তার চারদিকে ধানক্ষেত।

মনিপুরের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন, মনিপুর হোল ভারতবর্ষের সুইজারল্যান্ড। বাবা নিজের অনুভূতি থেকে বলেছিলেন যে মনিপুর হোল দ্বিতীয় জাপান। লোকজনের চেহারা থেকে শুরু ক'রে তাদের আচার আচরণ, ব্যবহার, পাহাড়ে ঘেরা পরিবেশ জলবায়ু, চালের স্বাদ, শাকসব্জি (রান্নার পদ্ধতিটা আলাদা), এসবেরই জাপানের সাথে মিল ছিল। তাই বাবাকে পুরোনো জাপানের কথা মনে করিয়ে দিত।

নাচ শিখতে গিয়ে আমাকে যা আকর্ষণ করেছিল সেটা হোল সর্বপ্রথমে গুরুকে প্রণাম করার পদ্ধতি। হাঁটু গেঁড়ে বসে, দু হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে মাথা নত ক'রে প্রণাম করাটা একদম জাপানের মত। জাপানেও কোনও ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলা শিখতে গেলে শিক্ষককে প্রণাম বা শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করা হয়। তাছাড়া মনিপুরে গুরুদেবের সামনে গুরুকে সম্মান জানিয়ে বসারও নিয়ম আছে। মনিপুরের লোকজনের জীবনের সঙ্গে নৃত্যগীত ও বাদ্যযন্ত্র জড়িত। সারা বছরের ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবগুলিতে যেমন বিবাহ অনুষ্ঠানে, শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে গান-বাজনা (সংকীর্তন) ও নাচগান হয়ে থাকে।

মনিপুরী নৃত্যের যে সৌন্দর্য তা হোল লীলায়িত দেহভঙ্গি, কোমল পদক্ষেপ, চাপা মুখের অভিব্যক্তি। সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবকে কেন্দ্র ক'রে সেখানে এক সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে, যা মনিপুরের একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। সেখানে শিল্পী ও দর্শক ভক্তিরসে আপ্লুত হয়ে ধর্মীয় বা আত্মিক ভাবাবেগ উপলব্ধি করেন। মনিপুরে গিয়ে বিশুদ্ধ মনিপুরী নাচ দেখে আমার এই নৃত্যশৈলীর প্রতি বিশেষ অনুভূতি হোল যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। আমার মনে হয়েছে যে এই নাচ ঠিক মঞ্চের উপযোগী নয়, মন্দির প্রাঙ্গণে দেবদেবীর প্রতি সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের নাচ।

মনিপুরে নাচ শিখতে গিয়ে একটাই সমস্যা হয়েছিল, সেটা হোল ভাষার সমস্যা। তরুণ বা মাঝবয়সী লোকেরা হিন্দী বা ইংরেজী বোঝেন, কিন্তু বয়স্ক প্রৌঢ়রা মনিপুরী ভাষা ছাড়া বলেন না। মনিপুরের নিজস্ব লিপি থাকলেও তারা বাংলা লিপিও ব্যবহার করেন, কিন্তু কথোপকথনের ভাষা একেবারেই আলাদা। নিজেদের ভাষাকে তারা বলেন 'মৈতেইলোন'।

মনিপুরের মানুষ সম্বন্ধে দু এক কথা না বলে পারছি না। মনিপুরের মহিলারা খুব পরিশ্রমী হন। জাপানের মতোই তারা কাজের লোক রাখেন না, ঘরের সমস্ত কাজ নিজেরাই করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার নিজের ধানক্ষেতে নিজেই লাঙল চষছেন দেখে আমরা খুবই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অফিসে যাওয়ার আগে কিছুক্ষণ মাঠের কাজ করে যাওয়াটা ছিল তাঁর অভ্যেস। আবার এক সময় মনিপুর থেকে একটি মেয়ে শান্তিনিকেতনে এসেছিল জাপানি ভাষা পড়ার উদ্দেশ্যে। প্রথম কয়েকটা দিন সে আমাদের বাড়ীতে উঠেছিল। রোজ সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই সে ঘর, বারান্দা, উঠোন সব ঝাঁট দিত। সেই দেখে বাবা, মা মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, এ একদম পুরোনো জাপানীদের গুণ।

মনিপুর থেকে বেশ কয়েকবারই নাচের দল জাপানে অনুষ্ঠান করতে এসেছেন। তাদের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তো অবশ্যই, আচার ব্যবহারে এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়েও তারা জাপানিদের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এই নম্র স্বভাব যেন তাদের নাচের মধ্যেও ফুটে উঠেছে।

আমার মনিপুরে যাওয়া হয়নি কয়েক বছর। এখন আমরা বিদেশীরা সীমিত সময়ের জন্যে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি ছাড়াই যেতে পারি, কিন্তু আবার যাওয়ার সুযোগ কবে যে আসবে জানিনা।

মনিপুরের নাচের গুরু, গুরুজন এবং প্রিয় বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে আমি এই লেখা শেষ করছি। ■

ঘুরে বেড়ানোর গল্প

- বিদিশা সেনগুপ্ত

আমার কাজই হচ্ছে ঘুরে বেড়ানোর খবর দেওয়া। একটাই দেশের খবর নিয়ে ঘুরে বেড়াই নানাদেশে। সবাইকে বলতে হয়, আমার দেশ ভারতে যেও কিন্তু। একটা সময় ছিল দেশের মানুষকে খবর দিতাম কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায়, আর তার ফাঁকে নিজেও ঘুরে বেড়াতাম নিজের দেশের ছোট বড় জায়গায়।

ঘুরে বেড়ানোর কাজটা মানুষ অনেক কাল আগে শুরু করেছে, সেই প্রাচীনের তালিকায় তালিকাভুক্ত। পুরোনো জিনিসের খোঁজ রাখা, পুরোনো স্মৃতির চর্চা – সবই মানুষের স্বভাবজাত কাজ। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে ফেলে আসা দিনের পরিচিত জনের খোঁজ পেলে। বেশ আরাম – এক ঝলকে কত কথা, স্মৃতি ভেসে ওঠে। ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে যে কতরকম ঘটনা ঘটে তার একটা আলাদা ফর্দ করবো। আমার সৌভাগ্য এই পেশাতে (পর্যটন) থেকে দেখছি, কেবল ঘটনাই ঘটেছে, দুর্ঘটনা ঘটেনি।

বাঙ্গালীদের খুব ঘুরে বেড়ানোর শখ। আমি তখন কলকাতায়, সদ্য ক্লাস ঘর থেকে বেরিয়ে অফিস ঘরে ঢুকেছি। আমারই সাথে আমার থেকে ছোট একটা ছেলে চাকরীতে এসেছে, ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। সব দেখে শুনে তাকে বলেছিলাম – এ'তো মহাবিপদ, এতক্ষণ অফিসে থাকতে হবে, এর মধ্যে তো আমরা দুপুরের শো'তে সিনেমা দেখে নিতে পারি। কলকাতার অফিসটা চৌরঙ্গী পাড়ার মাঝে, জাঁকজমকের অন্ত নেই, নিত্যনতুন কাণ্ড ঘটতো। যা হোক অফিস ফাঁকি দিয়ে একদিনের জন্যেও সিনেমা দেখার রেকর্ডটা আর করে উঠতে পারিনি। কারণ কলকাতা ও বাঙ্গালীরা কখনও আমাদের একা থাকতে দেয়নি। কলকাতার বর্ষা বা নিম্নচাপের তুফানেও কেউ না কেউ ঘুরতে ঘুরতে এসেছেন –কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় খোঁজ নিতে। এইভাবে হাসি ঠাট্টা, মজা, উটকো ঝামেলা, ছোট খাটো আপদ-বিপদ নিয়ে সবার আড়ালে স্মৃতির সম্পদ তৈরী হতে লাগলো। আমার ঘোরার পরিধিও বাড়তে লাগলো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, জীবনে প্রথমবার আমেরিকাতে ঢুকেছিলাম পায়ে হেঁটে। নায়গ্রা দেখছি ওন্টারিওতে (কানাডা) দাঁড়িয়ে। যখন ভাবছি ওপারটায় যাই, ঠিক তখুনি আমার মেয়ের খাবার কথা মনে পড়লো। সে তখন খুবই ছোট, তার কথা শুনতেই হলো, না হলে বিপদ। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি মেয়ে, বাবা জল না দেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। আমাদের একটা পারিবারিক নিয়ম আছে। সেটা হ'লো ঘুরতে যখন বেরিয়েছো, দিনের বেলা বাসে বা ট্রেনে, গাড়িতে ঘুমাতে পারবেনা। দুচোখ খুলে দুদিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। অবশ্য প্লেনে ঘুমাই, মেয়ে না ঘুমিয়ে সিনেমা দেখে। যা হ'ক ওপার থেকে নায়গ্রা দেখার জন্য পুলিশকে জিজ্ঞেস করলাম এখন বাস কোথায় পাবো বলুন তো? জেনে নিলেন পাসপোর্ট আছে কিনা। তারপর বললেন এইটুকু তো রাস্তা। ব্রিজটা দিয়ে হেঁটে চলে যান। এইভাবে হেঁটেই ঢুকে পড়লাম আমেরিকায়।

বুখারেস্টে গেছি একটা ট্রেড শোতে যোগ দিতে। অফিসের বাইরে ইউরোপে আমার প্রথম কাজ। গিয়ে দেখি আয়োজকরা গণ্ডগোল পাকিয়েছে এবং ফলে মহা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। ইতিমধ্যে লোকসমাগমও শুরু হয়ে গেছে। এদিকে আমি তো মুখ ভার করে বসে আছি। ইণ্ডিয়ার নাম দেখে অনেকেই দৌড়ে দৌড়ে আসছে। এক ভদ্রমহিলা অতি উৎসাহে কিছু বলার চেষ্টা করছেন, অথচ আমার মাথায় কিছু ঢুকছেনা। কিছুক্ষণ পরে বুঝলাম – 'নহন্যতে'র নায়ক মির্চা ইউক্লিডের কথা বলছেন। মৈত্রেয়ী দেবীর লেখা বই। ভদ্রমহিলার কাছ থেকে জানলাম রোমানিয়াতে মৈত্রেয়ীদেবীর পরিচিতি ও জনপ্রিয়তার কথা। দেশে ফিরে মির্চা ইউক্লিডও লিখেছিলেন কলকাতার স্মৃতি, অভিজ্ঞতা। যে লেখা কলকাতাকে, বাঙ্গালীকে নিয়ে গেছে রোমানিয়াতে। ভদ্রমহিলা জানালেন মির্চা ইউক্লিড পরে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। উনি সেদিন ওখানে আমার মুখের ফোলাটা কমাতে পেরেছিলেন।

দক্ষিণ আমেরিকাতে ভারতীয় রাজদূত শ্রী বিশ্বনাথন কূটনীতিক হিসাবে খুব বিখ্যাত ছিলেন। ওনারই অনুরোধে আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, প্যারাগুয়েতে ভারতীয় পর্যটনের বেশ কিছু অনুষ্ঠান করা হয়। আমরা তখন নিউইয়র্কে থাকতাম। আমার স্বামীর সাথে আর্জেন্টিনার ভারতীয় দূতাবাসের খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। অফিসের কাজ নিয়ে আমরা দুজনে রওনা দিলাম আর্জেন্টিনার উদ্দেশ্যে। মেয়ের তো পোয়াবারো, বাড়িতে তিনি একাই সর্বেসর্বা। বুয়েনস আইরিসের দূতাবাস থেকে একটা বিরাট দল রওনা দিল উরুগুয়ের উদ্দেশ্যে। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন। রাতে আমার পাশে বসে এক ভদ্রলোক খাচ্ছেন। ভারতীয় রান্নার ব্যবস্থা ছিল। আমি ভদ্রলোককে চিকেন, মাছ খেতে বললাম। শুনে ভদ্রলোক জানালেন উনি শুদ্ধ থাকতে চান, কারণ কোনো প্রাণীর অংশ (চিকেন, মাছ ইত্যাদি) নিজের শরীরে নিয়ে প্রাণ ত্যাগ করতে চান না এবং প্রাণীর খাদ্যাংশ শরীরে নিয়ে কবরস্থ হতে চান না। আশাতীত এই উক্তি শুনে আমি ভদ্রলোককে ভারত ভ্রমণের কথা বললাম। সেখানেও ওনার বাধা, কারণ স্ত্রী ওনাকে ভারতে যেতে দিতে চান না। ভারতে গেলে যদি আর না ফেরেন। এই রকম নির্মল তত্ত্ব, গভীর অনুভূতির সামনে সযত্নে চাপা দিলাম আমার ফচকে হাসিকে।

ঘুরে বেড়ানোতে আমার ক্লান্তি নেই, কারণ এটা আমার কাজ ও ভাল লাগে। তাই বলে আলসেমিকে অযত্ন করতে পারি না। আলসেমি আমার অতি প্রিয়। এ'হেন লোককে গরমের মধ্যে উরুগুয়ে, প্যারাগুয়েতে খালি ফুটবল স্টেডিয়াম দেখিয়েছে। খেলাধুলো আমি মোটেই ভালবাসি না। একবার ডাক্তারের অফিসে 'ফর্ম'এ লিখেছিলাম 'কেবল হাঁটা'ই আমার একমাত্র ব্যায়াম। যাহোক, বুয়েনস আইরিসে ফিরে এলাম। নানারকম কথাবার্তার মাঝে স্থানীয় এক ভদ্রমহিলাকে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলাম। লক্ষ্য করলাম তথ্য ঠিকঠাক বলছেন ওদের দেশের মহিলা কবি ওকাম্পোর ব্যাপারে। অতি অসুস্থ রবীন্দ্রনাথকে ভিক্টোরিয়া নিজের দায়িত্বে রেখে, সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন। এরপর কবি বিশ্রামের জন্য ওখানে কিছুদিন ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া' নাম দিয়েছিলেন কবি ওকাম্পোকে। স্থির হোল ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর বাড়ি দেখতে যাবো, সাথে যাবেন লুসিলা। যে ক'দিন ওখানে ছিলাম, লুসিলার সাথে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেছিলো। লুসিলার চেষ্টাতেই আমরা রওনা হলাম। শহর থেকে ঘন্টা দুয়েকের রাস্তা।

নিঃসন্দেহে অতি সুন্দর দৃশ্য। ফাঁকা রাস্তা, গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চলেছে, আর আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি স্মৃতির পাতায় সঠিক ভাবে সব কিছুকে ভরে রাখতে। ঘর বাড়ি গাছপালা দেখতে দেখতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম।

অনেকটা জমি সহ বড় বড় গাছপালায় ভরা একটা দোতলা বাড়ি। খড়খড়ি দেওয়া কাঠের জানালা। দেখে মনে হোল কলকাতার কোনো বাড়িতে চলে এসেছি। বাড়ির বাইরে থেকেই অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে আছি। বাগানের গাছপালা দেখে মনে হোল ছোটখাট বটানিকাল গার্ডেন। গাছ মানে বড় বড় বৃক্ষ। বাড়িটা এখন মিউজিয়াম। ভিতরে ঢুকেই দেখলাম ইন্দিরা গান্ধীর ছবি, এক ভারতীয় মহিলাও ছবিতে আছেন। অন্যান্য জিনিসের (বই ইত্যাদি) মধ্যে পন্ডিত নেহেরু এবং রবীন্দ্রনাথের ছবিও রাখা ছিল। দোতলার খোলা বারান্দা থেকে দেখলাম সামনের একটা বাড়িতে কবি (রবীন্দ্রনাথ) থাকতেন। লুসিলাও সাগ্রহে সব ঘুরে ঘুরে দেখলো। সাপ্তাহিক ছুটি থাকাতে অন্য কোনো দর্শক ছিল না। আমি অনেক দূর থেকে এসেছি শুনে, দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। কিছুক্ষণ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনা হোল, ওকাম্পোর জীবন সম্পর্কেও কিছু খবর পাওয়া গেল। মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ স্প্যানিশ ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে একটা বই উপহার দিয়েছিলেন। ফেরার পথে পুরো রাস্তাটা ষোল আনা লাভের হিসাব করতে করতে চলে এলাম।

দিল্লি থেকে আমি টোকিওতে বদলী হয়ে আসি। দিল্লিতেও আমরা প্রায় অনেক বছর আছি। তাই "কোথায় বাড়ি" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় আমি সবসময় হোঁচট খাই। সেখানে বসেই জানতে পারলাম চিকা তায়রা নামে একজন ভদ্রমহিলা আমাদের টোকিও অফিসে কাজ করেন, শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করার দরুন বাংলা বলেন। জাপানের সাথে বাংলা, শান্তিনিকেতনের বেশ পুরনো যোগাযোগ। আমার জন্য ভালোই হল, পুরনোকে খোঁজার নেশাটা ঝালিয়ে নিতে পারবো। প্রথম কাজটা তায়রা সানকে দিয়ে শুরু হল। শান্তিনিকেতনের কজনকে আমরা দুজনেই চিনি তার একটা হিসেব করা গেল। স্কুল পড়ুয়া সেৎসু ছিল পাঠভবনের ছাত্রী। ভারী মিষ্টি মেয়ে, খুব সুন্দর নাচও করতো। ওর বাবা মাকিনো সানও (সাইজি মাকিনো) জাপানী ভাষা পড়াতেন। আমার বন্ধুরা মাকিনো সানের কাছে জাপানী পড়তো। সাইকেল চালিয়ে আশ্রমের মধ্যে ক্লাশ নিতে আসতেন শান্ত, নিরীহ মানুষটি। এখানে এসে জানলাম উনি হঠাৎ মারা গেছেন বোধগয়াতে। সেৎসু কিছুদিন আগে পর্যন্ত হিরোশিমাতে থাকতো, এখন থাকে টোকিওতে। মাকিনো সানের মতো মানুষদের নিরলস প্রচেষ্টা দুই দেশের মানুষকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আমাদের টোকিও অফিসে একটা বইতে দেখেছি সস্ত্রীক মাকিনো সান পন্ডিত নেহেরুর সাথে দেখা করছেন।

টোকিও'র ভারতীয় দূতাবাসে ইউকা ওকুদা সান রবীন্দ্র সঙ্গীত এবং বাংলা ভাষা শেখান। কি সুন্দর বাংলা বলেন। দুঃখ একটাই, এত অল্প সময়ে এরা কি সুন্দর বাংলা শিখেছে, আমিই জাপানীটা রপ্ত করতে পারিনি। গতবছর একদিন হঠাৎ 'সেনসেই' 'সেনসেই' করতে করতে তায়রা সান আমার ঘরে ঢুকে পড়লো। কি হোল জিজ্ঞেস করতে বললো 'আপনার টিচার ইয়ামাশিতা সান এসেছেন'। ওঁর কাছে কিছুদিন জাপানী পড়েছিলাম। ছাত্রী জীবনে ভাষার ক্লাস (ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাস) মাঝপথে ছাড়ায় আমি মহা তৎপর ছিলাম। আমার বন্ধুদেরও উৎসাহ দিয়ে ক্লাস ছাড়াতাম। কারণ ছিল পড়াশোনার মূল বিষয়কে রক্ষা করা। এখানে একটা কথা বলা দরকার, আমাদের সময় অতি অল্প পয়সায় উচ্চ মানের বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল ভাষা শিখতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অনেক পয়সা খরচ করতে হয়। যাইহোক, প্রায় তিরিশ বছর পর ইয়ামাশিতা সানের (কোইচি ইয়ামাশিতা) সাথে দেখা হোল। ওনার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আমিই বোধহয় একজন যার সাথে তাঁর নিজের দেশে দেখা হোল। চেহারার এমন পরিবর্তন কেউ চিনিয়ে না দিলে চিনতেও পারতাম না।

জুন মাসের (২০১৬) প্রথম সপ্তাহে নারা থেকে ফিরে নানারকম ঝামেলা নিয়ে অফিসে বসে আছি। সামনে বসে তায়রা সান। হঠাৎ আধ-ভেজানো দরজা দিয়ে উঁকি মারতে মারতে এক লম্বা ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। ওনাকে দেখেই তায়রা সান বলে উঠলো, 'শান্তিনিকেতনে পড়েছে, বাঁশি বাজাতো। ঠিক যেন এনারই অপেক্ষায় ছিল তায়রা সান। যদিও আমি অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ঝামেলার মধ্যে ছিলাম, তবুও বসতে বললাম। যে প্রশ্ন নিয়ে এসেছিলেন তার উত্তরও দিলাম। একজন শিল্পীকে সাথে নিয়ে শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছেন। কারণ রবীন্দ্রনাথের প্রথমবার জাপান ভ্রমণে আসার শতবর্ষ পালন হচ্ছে। তারপর পুরোনো কথা শুরু হতেই জানা গেল উনি ফিলোজফিতে (দর্শন শাস্ত্র) এম, এ পড়তেন ওখানে। উনি প্রায়শই সূর্যাস্তের পর পূর্বপল্লী গেস্ট হাউজের (শান্তিনিকেতনে) দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজাতেন। লম্বা চওড়ায় যতটা জায়গা নিয়ে দাঁড়াতেন, ততটাই বড় বাঁশি প্রাণ খুলে বাজাতেন। যেমন সুর, তেমন ধ্বনি, তেমনি তার রেশ। আশপাশে সব নীরব, উনি একা সরব। অতি মনোরম অভিজ্ঞতা। আমি বললাম, 'আপনার বাঁশি আমি শুনেছি'। কারণ ওই রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে আমি হস্টেলে ফিরতাম। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হোল। প্রায় বত্রিশ / তেত্রিশ বছর পর। হিরো টাইপ চেহারার মানুষ, হঠাৎ আমার সামনে এলেন প্রায় বুড়ো। আমি তো না থাকতে পেরে বলেই ফেললাম, 'আপনি তো একদম অন্যরকম দেখতে ছিলেন'। হেসে স্বীকার করলেন। মনে পড়ে গেল, বাঁশি শুনতে শুনতে আমি সাইকেল চালাচ্ছি, শান্ত ফাঁকা পরিবেশ, সন্ধ্যে এগিয়ে আসছে।

ভদ্রলোক কখন অফিস ছাড়বেন তার প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমাদের টোকিও অফিসে আমরা তিনজন মহিলা কাজ করি, আর কেউ নেই। ভদ্রলোক উঠে যাওয়ার সাথে সাথেই শুরু হোল তার অনিন্দ্যকান্তি রূপের বর্ণনা। বলেই দিলাম এ'রকম সুন্দর দেখতে জাপানী আমি খুব কমই দেখেছি অথবা দেখিনি। তায়রা সান স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জানিয়ে চললো। যখন দেখেছিলাম তখন আমি হাইস্কুলে পড়ি অথবা সদ্য কলেজে ঢুকেছি। সুতরাং কোনও খুঁতই তখন ধর্তব্যের মধ্যে আসেনি। সৌন্দর্যের এরকম অবলুপ্তি --- এই চর্চাতেই সমাপ্তি ঘটালাম সেই অম্লান স্মৃতির।

বেড়ানো, পথচলা, সময় --- সবগুলোর গতি একই --- থামে না কখনো। আস্তে আস্তে হলেও আমি নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছি। যখন তাইপে-তে (তাইওয়ান) যাই, মনে হয় কতগুলো রাস্তা দক্ষিণ কলকাতার মতন। বিশেষ করে ফ্ল্যাটগুলো। দক্ষিণ তাইওয়ানে যখন কলাগাছ, মোচা, সমস্ত চেনা পরিচিত ফুলের গাছ দেখি, আনন্দে অস্থির হয়ে পড়ি। সবই তো আমার দেশে আছে। কলাগাছে মোচা অবশ্য আমি ওকিনাওয়াতেও দেখেছি।

এ লেখার খসড়া তৈরি হচ্ছে সিওলে (দক্ষিণ কোরিয়া) বসে। তাই মনে হোল কোরিয়ার খবরও লেখা দরকার। মিনা কাং নামে এক ভদ্রমহিলার খোঁজ করলাম। খুব ভাল নাচ করতেন। চিত্রাঙ্গদাতে সুরূপা হয়েছিলেন। এখনও খবর পাওয়া যায়নি। বছর দুয়েক আগে বুসানে এক কোরিয়ান ভদ্রলোক হঠাৎ আমাকে বললেন অযোধ্যার এক রাজকুমারী আমাদের দেশের রানী হয়েছিলেন। সাল-তারিখের যে গল্প পেশ করলেন, তার বিষয় ও সময় প্রাচীন ইতিহাসের অন্তর্গত। অযোধ্যার রাজকুমারীর সময়কাল হোল ৫৭ – ১৮৮ খ্রীষ্টাব্দ। প্রাচীন ইতিহাসের অনেক সাল তারিখ আনুমানিক হয়, বিশেষ করে সমকালীন সাহিত্য বা প্রত্নতাত্ত্বিক লিপিতে উল্লেখ না থাকলে। অযোধ্যার রাজকুমারীর কোরিয়ার রানী হওয়ার গল্প আমার জানার বাইরে ছিল। তবে এই গল্প কোরিয়ানরা অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্বাস করে। রাজকুমারী শ্রীরত্ন প্রায় ১০০ বছরের বেশী সময় কোরিয়াতে ছিলেন। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও অযোধ্যার রাজবংশের নাম জানতে পারিনি। রাজকুমারী অযোধ্যায় থাকাকালীন স্বপ্ন দেখতেন তার বিয়ে কোরিয়াতে হবে। রাজকুমারীর বাবাও স্বপ্নে দেবীর একই রকম আদেশ পান। অতঃপর শ্রীরত্ন লোকলস্কর নিয়ে সমুদ্রপথে কোরিয়ার বুসানের কাছে উপস্থিত হন। গল্পটা এইটুকু শোনার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কোরিয়ার রাজা কেন বিয়ে করেছিলেন'? শুনলাম রাজাও নাকি একই রকম স্বপ্ন দেখতেন। রাজবংশের নাম 'গায়া' (বাংলা উচ্চারণে) এবং জায়গার নামও 'গায়া'। বুসানের কাছে এই জায়গা।

রাজকুমারী শ্রীরত্ন বিয়ে করেন রাজা কিম সুরো'কে। রাজা কিম সুরো'র সময়কাল ৪২ – ১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ, নিঃসন্দেহে আনুমানিক সময়। বিয়ের পর রাজকুমারী শ্রীরত্নের নাম হয় হুন হোয়াং ওক। এই রাজপরিবার আধ্যাত্মিক বিষয়ে বা কাজে খুবই সচেষ্ট ছিল। এদের ৭টি সন্তান (ছেলে) পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এই রাজপরিবারের বংশধররা অনেক গোত্রের (কোরিয়ান) সৃষ্টি করেন। এঁদের উত্তরসূরী হলেন প্রধানমন্ত্রী কিম জংফিল। ইনি দুবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন (১৯৭১ – ৭৫ এবং ১৯৮২ -২০০০)। রাষ্ট্রপতি কিম দেও জং এই রাজপরিবারের বংশধর।

ভারত – কোরিয়া'র এই দুই রাজপরিবারের কাহিনী ধারাবাহিকভাবে কোরিয়ান সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। অযোধ্যাতেও ইন্দো-কোরিয়ান পার্ক আছে। সেখানে কোরিয়ান স্মারক স্থল ২৭শে ফেব্রুয়ারী ২০১১ তে তৈরি হয়। এই বিষয়ে ভারতীয় কূটনীতিক শ্রী এন পার্থসারথী বইও লিখেছেন। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক (মিঃ লি) অযোধ্যায় এবং উত্তর প্রদেশের বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক স্থানে বেড়াতে যান। অযোধ্যার পুরোনো বাড়ির ছবি তুলে আনেন এবং আমাকে দেখান। ওখানকার স্থানীয় চিহ্ন হচ্ছে বাড়ির সদর দরজার ওপরে দু'দিক থেকে মাছের ছবি আঁকা। সেই চিহ্ন বুসানের কাছে গায়া'তেও আছে। এত পুরোনো দিনের গল্প সবিশ্বাসে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কোরিয়াতে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আরো এরকম অনেক গল্প জানা যাবে যদি আমি ঘুরতে থাকি। দেশে ফিরে বিদেশের বন্ধুদের সঙ্গে যখন দেখা সাক্ষাত হয় খুব ভাল লাগে। ঘুরে বেড়ানো'র এই গল্পগুলো স্মৃতির পাতায় ছাপা হয়ে আছে। ■

বাগবাজার

- তপন কুমার রায়

বাঙ্গালী পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাকুক 'কোলকাতা' শব্দটি শোনা মাত্র ওদের কান খাড়া হতে বাধ্য। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে পড়তে গেলে আমাদের কাছে জোব চারনক, সুতানুটি, গোবিন্দপুর, কালীঘাট ইত্যাদি শব্দ অতি পরিচিত। কিন্তু বাগবাজারকে বাদ দিয়ে কলকাতার কোন ইতিহাস রচনা একরকম অসম্ভব। বাগবাজার শব্দের উৎস কেউ বলে কোন এক সাহেবের বাগানের নাম থেকে, আবার কেউ বা বলে ঐ জায়গায় হুগলী নদীর বাঁক থেকে বাগবাজারের নামকরণ। একথা অবশ্যই মানতে হবে যে দ্বাদশ শতকের আগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মত বাগবাজারের ইতিহাসও অনেকটাই অনুমান ভিত্তিক। তবে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাগবাজারের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব ধরা যায়।

আকবর বাদশার আমলে সপ্তগ্রাম ছিল একটা বিশাল ব্যবসায়িক কেন্দ্র। কালিদাস বসাক আর মুকুন্দরাম শেঠ সুতো আর কাপড়ের পণ্যদ্রব্য এই বন্দর থেকে ভারতবর্ষ ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পাঠাত। বিনিময়ে সপ্তগ্রামে আসত মশলা আর অন্যান্য পণ্য যা স্থলপথে ভারতের অন্যান্য জায়গায় যেত।

আনুমানিক ১৫২০-৩০ সাল নাগাদ সরস্বতী নদী মজে যাবার পর নদী পথে ব্যবসা করতে গেলে গঙ্গার আরও দক্ষিণে আসা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। চারনক প্রথমে কাশিম বাজার তারপর ক্রমান্বয়ে বালাসর, উলুবেড়িয়া, হিজলিতে বসতি স্থাপন করতে ব্যর্থ হলে শেষে সুতানুটি গ্রামে নোঙর করতে একরকম বাধ্য হন। এই সময় দিল্লীর বাদশা ওনাকে হুগলীতে কুঠি স্থাপন করতে বললেও উনি কিন্তু বরানগরের দক্ষিণপ্রান্তে সুতানুটি ছাড়তে রাজী হন নি। উনি দেখলেন বেগবতী ভাগীরথী নদী সংলগ্ন জায়গা হওয়ায় মোগল আর মারাঠিদের আক্রমণের মোকাবিলা করা যেমন সহজ হবে আর নদীপথে বড়বড় জাহাজের নোঙর করারও সুবিধে এই জায়গায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখনও পর্যন্ত জমির মালিকানা না পেলেও জমিদারী স্বত্বে প্রজাপালন করে খাজনা আদায়ের অনুমতি পেতে সক্ষম হয়েছিল। চারনক পতিত জমি আর জঙ্গল সাফ করে যে কোন লোককে বসতি স্থাপন করার অনুমতি দিলে, বরানগর আর হুগলীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে প্রচুর মানুষ এখানে বসতি স্থাপন করতে আসে। ১৬৯০ সাল নাগাদ চারনক জমির মালিকানা পাওয়ার পর আদেশবলে ইচ্ছেমত জমির দখল বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু খেয়াল খুশী মত ঘরবাড়ি তৈরি আর পুকুর কাটার ফলে আর কোন পয়ঃপ্রণালী না থাকায় ১৭০৫-০৭ সাল নাগাদ বহু মানুষের সঙ্গে প্রায় চারশ সাহেবেরও কলেরা মহামারীতে মৃত্যু হয়। এর পর জাস্টিস অফ পিস আর করপরেশান স্থাপিত হলেও শহরের স্বাস্থ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। রবার্ট ক্লাইভ তখন বাড়ীর ওপর ট্যাক্স বসাতে বাধ্য হন।

দেখতে দেখতে সুতানুটি আর গোবিন্দপুর তাদের নিজস্ব সত্তা হারিয়ে কখন যেন বাগবাজারের সঙ্গে মিশে গেল। আর বর্তমান কলকাতার উত্তর ভাগের বাগবাজার অঞ্চলেই নবজাতক কলকাতার নাড়ি কাটা হল। ইংরেজ ছাড়া ফরাসী, ওলন্দাজ এবং অন্যান্য ইউরোপীয়রাও এর চার ধারে ব্যবসার জন্য বসতি স্থাপন করেছিল। সে হিসেবে কোলকাতা তখন থেকেই বহুজাতিক শহরের মর্যাদা পেয়েছিল।

ব্যবসায়িক কেন্দ্র হিসেবে এর পর বরানগরের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে লাগল আর বাগবাজার ক্রমশ নেটিভদের বাসস্থান হয়ে উঠল। ১৭৪২ সাল নাগাদ মারাঠাদের রোখবার জন্য বাগবাজারের পূব দিকে একটা খাল কাটার পরিকল্পনা হয়, যার নাম ছিল মারাঠা ডীচ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এই খাল পুরোটা কাটার প্রয়োজন হয়নি।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি, যতদিন পর্যন্ত কোম্পানির রাজত্ব কায়েম ছিল আর অপরদিকে মোগল সাম্রাজ্যের দিন ঘনিয়ে এসেছে, ততদিনে কলকাতাও বাগবাজার ছাড়িয়ে নিজেকে আড়ে বহরে শ্যামবাজার হয়ে শিয়ালদা পর্যন্ত বাড়িয়ে নিয়েছে। এই সময় কোলকাতা গঙ্গার পাড় ধরে দক্ষিণে খিদিরপুর পর্যন্ত আর আদি গঙ্গার পাড় ধরে কালীঘাট, ভবানীপুর, আলিপুর ইত্যাদি অঞ্চলে বিস্তার লাভ করল। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যারা এখানে বসতি করল তারা ১৮৫৭ সালে সিপাই বিদ্রোহের শেষে রানীর আদেশনামায় কোম্পানির আমল থেকে মুক্তি পেয়ে রানীর নামে জয়ধ্বনি দিয়েছিল। সাহেবরাও নেটিভদের বসবাসের জন্যে বাগবাজার অঞ্চল রেখে দিয়ে নিজেদের বসবাসের জায়গা হিসেবে শহরের দক্ষিণ দিকটা আলাদা ভাবে রেখে দিল। ইংরেজ শাসক এই নতুন উপনিবেশের রাজধানীও এই শহরেই রাখল। শুরু হল বাগবাজারের হাত ধরে কলকাতার জয়যাত্রা আর শুরু হল এক নতুন জাতির উত্থান।

কলকাতার আদিবাসী যে কারা সে ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত আছে। তবে আপাত দৃষ্টিতে নজর করলে দেখা যাবে যে এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মানুষের সঙ্গে পূব দিকের ঢাকা চট্টগ্রাম থেকে শুরু করে পশ্চিমের মানভুম, উত্তরের বরেন্দ্র ভূমি থেকে দক্ষিনের রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা ব্যবসা থেকে শুরু করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিভিন্ন কারণে এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। কর আদায়ের সুবিধের জন্য ভারতের অন্যান্য জায়গার মত এখানেও জমিদারী প্রথা চালু হয় আর সেই সুযোগে অনেক জমিদারেরা সৎ এবং অসৎ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তৈরি হল বড়বড় প্রাসাদোপম অট্টালিকা আর তার সঙ্গে অদ্ভুত এক সংস্কৃতি যা বাবু কালচার নামে বিখ্যাত। হুতম প্যাঁচার নক্সা এই সময়কার সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থার সুন্দর প্রতিবেদন।

বাগবাজার অঞ্চলেই এই আবহাওয়ার মাঝে সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, চারুকলা, নাট্যচর্চা ইত্যাদির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটে। মানুষের মধ্যে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার উন্মেষও এই সময়ে হয় বলে ধরে নেওয়া যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ এখানে বসতি করল যারা বিভিন্ন ধরণের ভাষা, পোশাক, সামাজিক আচরণ-বিধিতে অভ্যস্ত ছিল। বাগবাজার হয়ে উঠল এক বিরাট পাত্রের মত যাতে নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান মিলে মিশে একটা নতুন সমাজের জন্ম দিল। বাগবাজারে জন্ম হল নতুন এক বাংলা ভাষা যা পূবের চাটগাঁইয়া বাংলাও নয় আবার পশ্চিমের মানভুমের ভাষাও নয়। জন্ম হোল চলিত ভাষার, কলকাতার বাংলা ভাষা যার উপর নির্ভর করে রইল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ। এরকম সময়ে বঙ্কিম আর মাইকেল যখন সংস্কৃত ঘেঁষা সাধু বাংলায় লিখে নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে মগ্ন, তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি আর শিমলে পাড়ার কায়স্থ পরিবারে রবি ঠাকুর আর বিলে নরেনের জন্ম বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাগবাজার থেকে পাট আর চুনের বড়বড় ব্যবসা ক্রমশ উত্তরে বরানগরের দিকে আর পূবে বেলেঘাটা অঞ্চলে সরে যেতে থাকলে বাগবাজার হয়ে উঠল বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের বাসস্থান। ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, নাটক, শিল্প, রাজনীতি ইত্যাদির কেন্দ্রস্থল হিসেবে কলকাতার প্রাণকেন্দ্র বাগবাজার হয়ে উঠল সারা ভারতের সংস্কৃতি চর্চার রাজধানী।

নটগুরু গিরীশ ঘোষ, দানিবাবু, নটসূর্য অহীন চৌধুরী, অমৃতলাল বোস, ধর্মদাস শূর, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি সেসময় কলকাতার বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। কলকাতার মঞ্চে তখন শেক্সপিয়ার অভিনীত হচ্ছে। এক কথায় কোলকাতা তখন লন্ডন অপেরাকে টেক্কা দিচ্ছে।

সে সময় বাগবাজারের নেটিভদের মধ্যে আচার-সর্বস্ব হিন্দু ধর্মের প্রতি একরকম অনীহা দেখা দিলে বহু মানুষ নিরাকার ঈশ্বর পূজারী খ্রিস্টান আর ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মান্তরিত হচ্ছিল। সাহেবরাও সেই সময় স্কুল-গির্জা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করেছিল যাতে প্রচুর শিক্ষিত বাঙ্গালী আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে বরানগরের কাছে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এক নিরক্ষর বামুন রামকৃষ্ণ পরমহংস, বঙ্গসমাজকে হিন্দু ধর্মের এক নতুন দিশা দেখালেন। স্থানীয় মানুষও ব্রাহ্মণ্য আচারসর্বস্ব হিন্দু ধর্মের বাইরে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়ে আত্মগরিমা ফিরে পেল। আর সেই সঙ্গে শুরু হল এক নতুন জাতীয়তা বোধের উন্মেষ।

বাগবাজারের ধনী সম্প্রদায়ের তৈরি বিশালাকার প্রাসাদোপম অট্টালিকাগুলোর ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও সে সময়কার বাগবাজারের অনেক ইতিহাস জানা যায়। এই সব অট্টালিকার শিল্পকলা পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে আনা হয়েছিল। সে জন্য কলকাতাকে এক সময় বলা হত প্রাসাদ নগরী। শোভাবাজারের দেবেদের, পাথুরেঘাটার ঘোষেদের, বা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের বাড়ীর কথা আমরা জানি। ১৮৭৮ সালে বাগবাজারের বোস পরিবারের প্রাসাদ নির্মাণ হয়েছিল বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রথম ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করা নীলমণি মিত্রের তত্বাবধানে। ১৮৯৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি শিকাগো ফেরত স্বামীজিকে এই বাড়ীর একতলায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয়েছিল।

ধনী সম্প্রদায় ছাড়াও সাধারণ মানুষ, যেমন ফরিদপুরের কানুরগাঁও

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ী

গ্রামের বিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশের দুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ নিজের গ্রাম পদ্মার গর্ভে বিলীন হলে তিন ভাইকে সঙ্গে নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ১২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের বাড়িটি তৈরি করেছিলেন। বিক্রমপুরের সেনহাটির বর্ধিষ্ণু পরিবারের বঙ্গ সেন পাটের ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে ৭২/১ বাগবাজার স্ট্রীটের তিনতলা বাড়িটি নির্মাণ করেছিলেন যেখানে বাগবাজারের বিখ্যাত আড্ডা বসত। পরবর্তী কালে যুগান্তর গোষ্ঠী এই বাড়ীতেই তাদের অফিস স্থানান্তর করেন। এর পর উল্লেখ করতে হয় ৮নং বিশ্বকোষ লেনের বাড়ীটার কথা। ১৯১৫ সালের ১৭ই মার্চ কাঁটাপুকুর বাইলেন থেকে রাস্তার এই নতুন নামকরণ হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন বইয়ের নামে রাস্তার নামকরণ এর আগে হয়েছে বলে শোনা যায় না। নগেন্দ্র নাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮) এই বাড়িতে বসে দীর্ঘ সাতাশ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রথম কোন ভারতীয় ভাষা বাংলায় বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। আরেক বিখ্যাত বাঙ্গালী দীনেশ চন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) নগেন বাবুর লাগোয়া সাত নম্বর বাড়িতে বাস করতেন। ওনার আদি বাড়ি ঢাকার সুয়াপুর গ্রামে। কবি সমর সেন বিশ্বকোষ লেনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ওনার পিতা অরুণ সেন এবং পিতামহ দীনেশ চন্দ্রের কথা লিখেছেন। ওনার দাদামশায় ছিলেন জগদীশনাথ রায় যাকে বঙ্কিম বাবু বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছিলেন। রাজা রাজবল্লভ স্ট্রীট যার নামে, তিনি ছিলেন মহারাজ দুর্লভরামের পুত্র। উনি মীরজাফরের প্রধান সচিব হিসেবে কাজ করার সময় মীরজাফর ওনাকে হত্যার চক্রান্ত করেন আর তা জানতে পেরে উনি বাগবাজারে ইংরেজদের আশ্রয়ে চলে আসেন (১৭৫৮)। এর অদূরেই আনন্দ চ্যাটারজী লেনে দুটি পাশাপাশি দোতলা বাড়িতে থাকতেন রাঙামাটির দেশের দুই দিকপাল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আর যামিনী রায়। একটির রঙ হলুদ আরেকটি লাল। ১৮/১১ রাজবল্লভ স্ট্রীটের বাড়িটিতে বাস করতেন উদয়শঙ্করের দলের সঙ্গীত পরিচালক এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকার গোকুল চন্দ্র নাগ। ১৫/৪ বাড়িটি সাক্ষী হয়ে আছে বিদ্রোহী কবি নজরুলের দুঃখময় অশ্রুসজল সময়ের। বাগবাজারের রাস্তার নামকরণ থেকেও সেসময়কার ইতিহাস খানিকটা আন্দাজ করা যায়।

বাগবাজার আরো অনেক কারণে বিখ্যাত। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত দুটি বিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃতবাজার/যুগান্তর এবং আনন্দবাজারের জন্মস্থান হল এই বাগবাজারে। অমৃতবাজার প্রতিষ্ঠা করেন শিশিরকান্তি ঘোষ। যুগান্তর এবং আনন্দবাজারের প্রতিষ্ঠাতা যথাক্রমে তুষার কান্তি ঘোষ আর সুরেশ চন্দ্র মজুমদার সংবাদ প্রকাশনা ছাড়াও সাহিত্য সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বাগবাজারের তিন গোপাল, ক্ষীরোদগোপাল, যাদুগোপাল আর ধনগোপালকে এক সময় বলা হত বাগবাজারের থ্রি মাস্কেটিয়ার্স। বিপ্লবী ক্ষীরোদ গোপালকে নিয়েই শরতচন্দ্রের পথের দাবীর অমর চরিত্র সব্যসাচী। রেঙ্গুনে অস্ত্র সংগ্রহ করার সময় শরত বাবুর সঙ্গে ওনার পরিচয়। ধনগোপাল লিখলেন "ফেস অফ সাইলেন্স" যার মুখ্য চরিত্র হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। বইটি পড়ে রম্যা রলা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ওনাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী রচনা করেন। যাদু গোপাল ছিলেন ডাক্তার কিন্তু বিপ্লবীদের প্রত্যক্ষ সাহায্য করায় সাহেবদের ক্ু'নজরে পড়েন। গোবিন্দ রাম মিত্র, রামনিধি গুপ্ত (নিধু বাবু), ভোলা ময়রা, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, গৌরিনাথ শাস্ত্রী, ভক্তিবেদান্ত প্রভুপাদ (অভয় চরণ দে), মোহিত কুমার মৈত্র ইত্যাদি কয়েকজনের নাম উল্লেখযোগ্য। বাগবাজারের উপর কবিতা লিখেছেন ঈশ্বর দত্ত, ভোলা ময়রা, শরতচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর), হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাস, সুনির্মল বসু, রূপচাঁদ দাস মহাপাত্র (পক্ষী), আনন্দ বাগচি এবং আরও অনেকে।

বাগবাজারের রসগোল্লার আগে আরেকটি ব্যাপারে না বললে অবিচার করা হবে। বাগবাজারের নেশার জগতে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যা অন্য কোথাও দেখা যায় নি। নেশার রকমফেরে নেশার আড্ডার অবস্থানও পালটাত। এই ছড়াটি তার প্রমাণ দেবে।

বাগবাজারে গাঁজার আড্ডা গুলির কোননগরে
বটতলায় মদের আড্ডা, চণ্ডুর বউবাজারে।

এর সঙ্গে আরেকটি ছড়ার উল্লেখ না করলেই নয়,

এক ছিলিমে যেমন তেমন, দুই ছিলিমে প্রজা,
তিন ছিলিমে উজির নাজীর, চার ছিলিমে রাজা।

নেশাভাঙ্গের সৃষ্টিকর্তা শিবচন্দ্র ঠাকুর তৈরি করেছিলেন পক্ষীর দল। এরা মদের নেশা পরিত্যাজ্য মনে করতেন। গাঁজা ইত্যাদি সেবন করে পাখির মত ব্যবহার করতেন। একবার এক বখে যাওয়া ছেলেকে তার বাবা উদ্ধার করতে এলে দেখেন ছেলেটি নেশা করে দাঁড়ের মত কি একটা জায়গায় বসে। কাছাকাছি আসতেই ছেলেটি বাপের হাতে কাঠঠোকরার মত ঠুকরে দেয়। এই দলটি নেশা ভাঙের মধ্যে প্রচুর গান আর কবিতা সৃষ্টি করেছিল যা আজও সাহিত্যের ছাত্রদের গবেষণার বিষয়। এর শেষ ব্যাটনটি এসে পড়ে এক উড়িয়া ব্রাহ্মণ রূপচাঁদ দাস মহাপাত্রের হাতে। ইনি রূপচাঁদ পক্ষী হিসেবে আজও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বর্তমান।

এই সময়ের সমাচার দর্পণের কয়েকটি খবরের নমুনা থেকে তদানীন্তন বাগবাজারের দরিদ্র শ্রেণীর অবস্থার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়।

"২০শে অক্টোবর ১৮৩৭ সালে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব অতি সমারোহে মাতৃ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন ..... দুই তিনদিনের পথ হইতেও অনেক ভিক্ষুক আসিয়াছিল। স্ত্রী-পুরুষ-বালক সাধারণ ন্যূনাধিক ২ লক্ষ লোক সমাগম হইয়াছিল"। পরের বছর ১৮৩৮ সালের ৩১শে মার্চ তারিখের সমাচারে .."শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকা নাথ ঠাকুরের মাতার লোকান্তর হয়। এইক্ষণে শুনা গেল, বাবু অতিসমৃদ্ধিপূর্বক মাতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়াছেন। গত শুক্রবারে বহু সংখ্যক কাঙ্গালীদিগকে ভোজন করাইয়াছেন। তাহাতে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে আট আনা এবং অন্যান্য শূদ্র ও মোসলমান ইত্যাদি কাঙ্গালীদের চার আনা করিয়া দিয়াছেন। এই সকল লোক ব্যবসায়ে কাঙ্গালী নহে। কিন্তু অতি দরিদ্র, মজুরী করিয়া দিনপাত করে। যদ্যাপি পোলিশের দ্বারা শহরের সীমাতে কোন প্রতিবন্ধক না হইত তবে বোধকরি লক্ষের অধিক ভিক্ষুক উপস্থিত হইত"। কলকাতায় বস্তি গড়ে ওঠার পিছনে তদানীন্তন বাগবাজারের বাবুদের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল তা আমরা প্রায় ভুলতে বসলেও ইতিহাস তা ভোলেনি। বাবু কালচারের উচ্ছিষ্ট ফলের অন্যতম ফলটি হল কলকাতায় অগণিত ভিখারি সমাবেশ ও তাদের স্থায়ী বসবাস।

বাগবাজারের আরেকটি অবদান হল খেলাধুলোয় বাঙ্গালীদের অংশগ্রহণ। পাড়ায় পাড়ায় জিমনাসিয়াম আর ব্যায়ামাগার ছাড়াও ধনী মানুষদের অট্টালিকার বাগানে ফুটবল খেলা একসময় খুবই জনপ্রিয় হয়ে

ওঠে। 'খেলা' শব্দের সঙ্গে 'ধুলো' শব্দটি কি এই ভাবে জড়িয়ে গেল? প্রখ্যাত পাট ব্যবসায়ী প্রিয়নাথ মিত্র, রাধাকান্ত দেবেদের উত্তরসুরিদের থেকে ১ নং ফড়িয়াপুকুর স্ট্রীটের সম্পত্তি কিনে নিয়ে সাহেবদের অনুকরণে বিশাল এক প্রাসাদ তৈরি করেন আর তার নামকরণ করেন 'মোহনবাগান ভিলা'। পিছনের বাগানে ছেলেরা ফুটবল খেলা শুরু করে যা পরবর্তী কালে ১৮৮৯ সালে একটা ক্লাবের রূপ পায় আর ক্লাবের নামকরণ হয় বাড়িটির নামে। প্রিয় মিত্র ছিলেন ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক। আরেক পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ব্যারিস্টার এইচ ডি বোস (হরিদাস বোস)। ব্যবসায়ে লোকসানের দরুন প্রিয়নাথ মাত্র দেড় লক্ষ টাকায় এই প্রাসাদোপম বাড়িটি ভুপেন্দ্রনাথ ও নিমাই বোসকে বিক্রি করেন। এনারাই পরবর্তী সময়ে মোহনবাগান ক্লাবকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ প্রসঙ্গে আরেকজনের নাম উল্লেখ করতেই হয়। ভুপেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যিনি পাখী সেন নামে বেশি পরিচিত ছিলেন। পূব বাংলার ঢাকা থেকে বাগবাজারের রামকান্ত বোস স্ট্রীটের একটা বাড়িতে বাসা বেঁধে ছিলেন। যৌবনে ইস্টবেঙ্গল ও ই বি রেলে খেলতেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে ঢাকার উয়াড়ী দলকে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। বাগবাজারের আরেকজন বাসিন্দা অজয় বোস চল্লিশ-পঞ্চাশ দশকের নামকরা ফুটবলার ও ক্রিকেট খেলোয়াড়। ১৯৫৭ সালে আকাশবাণীর ফুটবলের বাংলা ধারাবিবরণী ওনার এবং পুষ্পেন সরকারের হাত ধরে শুরু হয়।

বাগবাজার নামটির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে আরেকটি জিনিষের নাম "রসগোল্লা"। আর এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে ১৬৪ নং আপার চিতপুর রোডের বাসভবনের মালিক নবীনচন্দ্র দাসের নাম। এঁর পিতামহ মধুসূদন দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে বর্ধমানের আদিবাড়ী ছেড়ে সুতানুটিতে চিনির ব্যবসা শুরু করেন। এই সময় খান্দসারি নামে এক রকমের লাল চিনি হত যাকে পরিশুদ্ধ করে সুস্বাদু সাদা চিনির দানা তৈরি করা হত চিনির কলে। চলতি কথায় এই লাল চিনিকে বলা হত কাশির চিনি। নবীনের পিতামহ এই চিনি রপ্তানি করতেন। ওনার বাসভবন আর চিনির গুদাম ছিল কাশি মিত্তির ঘাটে। নবীনের জন্ম হয় ওনার পিতার অকাল মৃত্যুর তিন মাস পরে ১৮৪৬ সালে। ততদিনে ব্যবসায়ে মন্দা হওয়ায় বাড়ি ও গুদাম বিক্রি করে চিতপুর রোডের বাড়িতে চলে আসেন আর শুরু করেন নানা রকম মিষ্টির দোকান ছোট্ট একটি খড়ের চালের ঘরে যেখানে আজ এক বিশাল অট্টালিকা শোভা পায়। চিনির ব্যবসা ছেড়ে মিষ্টির দোকান করায় আত্মীয়স্বজনেরা ওনাকে খোঁটা দিয়ে নবীন ময়রা বলা শুরু করেন। আত্মীয়দের খোঁটার জবাবে পরে উনি শাস্ত্র ইত্যাদি ঘেঁটে প্রমাণ করেন যে এককালে মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারীরা সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করত। পরে উনি এই মর্মে একটি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন। উনি নিজে বিবাহ করেন ময়রা পরিবারের কন্যাকে যিনি ছিলেন প্রখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার কনিষ্ঠ পুত্র মাধবচন্দ্রের কন্যা ক্ষীরোদমণি। নবীনচন্দ্র ১৮৬৮ সালে রসগোল্লা প্রথম বাজারে আনেন। অবশ্য একদল ঐতিহাসিক বলেন উড়িষ্যার পুরী জেলায় নাকি রসগোল্লা আগেই তৈরি হত জগন্নাথ দেবের ভোগ/প্রসাদ হিসেবে। সেকালের একটি প্রচলিত ছড়া ছিল

বাগবাজারের নবীন দাস

রসগোল্লার কলম্বাস।।

নবীন চন্দ্রের একমাত্র পুত্র কৃষ্ণ চন্দ্র দাস (১৮৭০-১৯৩৫) প্রথম জীবনে বাড়িতে বসে হোমিওপ্যাথি চর্চা করলেও পিতৃবিয়োগের পরে কনিষ্ঠ পুত্র সারদাচরন কে নিয়ে জোড়াসাঁকোর চিতপুরে কৃষ্ণ চন্দ্র দাস কনফেকশানারস শুরু করেন। পরে ধর্মতলায় কে সি দাস কনফেকশানারস প্রতিষ্ঠা করেন যা আজ পর্যন্ত ডালহৌসি পাড়ার অফিসের বাবুদের এখনও টিফিন খাইয়ে চলেছে। ময়রার ব্যবসা ছাড়াও নবীন চন্দ্রের সঙ্গীত চর্চা নিয়ে সে সময় অনেক কথা শোনা যেত। পিয়ানো আর চেলো বাজানর দক্ষতার জন্য সাহেবদের অনেক কনসার্ট ওনাকে বিভিন্ন আসরে নিয়ে যেত। উনি অবশ্য কখনই এটিকে পেশা হিসেবে নেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বাগবাজারের যাত্রা শুরু হয়েছিল কলকাতার জন্মলগ্নে। বাগবাজারে জন্মেছিলেন পৃথিবী বিখ্যাত বহু মানুষ যারা বাঙ্গালীকে আজও গর্বিত করে। কি করে জানিনা আধুনিক কলকাতার মানুষেরা বাগবাজারকে ঘটিদের জায়গা বলে চিহ্নিত করে। নীরদ সি লিখেছেন উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় করপরেশানের পাইপের জল আসত না আর পাতকুয়ো ছিল একমাত্র জলের উৎস। বাড়ীর মেয়েরা ভারী বালতি তুলতে পারত না বলে জল তোলার জন্য ঘটি ব্যবহার করত। দড়ির বাঁধন আলগা হওয়ার দরুন মাঝেমাঝেই কুয়োতে ঘটি ডুবে যেত আর প্রতি রবিবার সকালে ঘটি তুলি বলে একদল লোক লাঠিসোটা নিয়ে হাঁক পাড়ত। এখানকার অপেক্ষাকৃত পুরনো বাসিন্দারা যখন পূব বাংলার মানুষদের বাঙাল বলে হেয় করা শুরু করল তার উত্তরে বাঙালরা এদের ঘটি সম্বোধন করতে লাগল। কিন্তু ইতিহাস বলে যে এখানে সারা বাংলার মানুষই ঘাঁটি গেঁড়ে ছিল সেই চারনকের আমল থেকে। বাগবাজারের ইতিহাস আর ঐতিহ্য এদের সবাইকে বাদ দিয়ে কি করে হয় জানি না।

কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ দিয়ে উত্তর দিকে হাঁটতে গেলে রাস্তার দু'ধারে এখনও অনেক প্রাসাদোপম অট্টালিকা নজরে পড়বে যা বাগবাজার আর কলকাতার ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়ের বাঁ দিকে চলে গেছে বাগবাজার স্ট্রীট। সন্ধ্যের মুখে রাস্তার দু'ধারে ছোটছোট তেলেভাজার আর মিষ্টির দোকান ঘিরে নানান রকমের আড্ডা আর গুলতানি নজরে আসে। গায়ে গায়ে লাগানো ছাদের শ্যাওলা ধরা পাঁচিলের দুপ্রান্তের বাসিন্দাদের মধ্যে এখনও কি ভাবের আদান প্রদান হয়?

প্রয়াত অভিনেত্রী কেয়া চক্রবর্তী বাগবাজার সম্বন্ধে খুব সুন্দর একটা কথা বলেছিলেন। "আমি যদিও বাগবাজারের বাসিন্দা নই কিন্তু নাটকের জন্য আমাকে এই অঞ্চলে দিনের অনেকটা সময়ই কাটাতে হত। গণেশ যেমন মায়ের চারপাশে ঘুরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জেনে ছিল সেই রকম বাগবাজারের চারপাশ ঘুরলেই কোলকাতা শহরটা জানা হয়ে যায়। " ■

অনুচ্চারিত

- অরুণ গুপ্ত

সঞ্জয় কৃষ্ণার প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে যে মেয়েটাকে দেখে জিৎ চন্দ্রাহত হোল তার নাম মানালী। সঞ্জয় ও তার স্ত্রী কৃষ্ণা জিৎএর অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই বিনা সংকোচেই কৃষ্ণার কাছে গিয়ে মেয়েটার নাম জানার ইচ্ছা প্রকাশ করতেই কৃষ্ণা চোখ মটকে বলল, 'তাহলে আমার বন্ধু মানালীর দিকে নজর পড়েছে'। জিৎ এবার অনেকটা অভিযোগের সুরে বলে, 'এতদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে কেন'?

'ওরে বাবা, কি সাঙ্ঘাতিক লোক তুমি। এ্যাই শুনছো'? কৃষ্ণা চেঁচিয়ে সঞ্জয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সঞ্জয় কাছে আসতেই বলে, 'শুনছো জিৎএর কথা ? ও অভিযোগ করছে, মানালীকে আমরা ওর কাছ থেকে কেন এতদিন লুকিয়ে রেখেছি'।

'কারণটা বলোনি যে তোমার বন্ধু প্রেমে হাবুডুবু না খেলেও, অ্যাডভান্সড লার্নিং কোর্স করছে', সঞ্জয় বলে। জিৎ একটুও দমে না গিয়ে জানতে চায়, 'কে সেই ভাগ্যবান লোক, জানতে পারি কি'? সঞ্জয় উত্তর দেওয়ার আগেই উত্তর দেয় কৃষ্ণা। 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জানতে পার। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তির নাম ডঃ শতদ্রু সান্যাল'। কৃষ্ণার কাছ থেকে উত্তরটা পেয়ে জিৎ বিধান দিল, 'তাহলে তোমার বন্ধুর লাইফ হেল। কারণ জানই তো ডাক্তারদের ফ্যামিলি লাইফ বলে কিছু থাকেনা। কে বলতে পারে বিয়ের কয়েক দিন পরেই আইনজীবির সাহায্য নিতে হতে পারে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য'।

'বালাই ষাট, আমার বন্ধুর সেই অবস্থা হবে কেন ? হ্যাঁ, শতদ্রু নিঃসন্দেহে খুব ব্যস্ত ডাক্তার। হসপিটাল ও নিজের চেম্বার নিয়ে সারা সপ্তাহ প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকে। কিন্তু মিথ্যে বলব না, তার মধ্যেও মাসে একবার মানালীর সাথে ডে স্পেন্ড করার চেষ্টা করে। এই তো সেদিন মানালীর জন্মদিনে ওকে মোকাম্বোতে ডিনার খাওয়ালো'।

কৃষ্ণা থামতেই জিৎ ঠোঁট উল্টে বলে, 'প্রেমের সূচনাতে এসব দেখানোটাই রীতি, কিন্তু বিয়ের পরে বিশেষ করে একজন ডাক্তারের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে শবরীর প্রতীক্ষা ছাড়া মেয়েদের আর কিছুই জোটেনা'। ওর কথার প্রতিবাদ করে কৃষ্ণা বলে, 'কপালে যাই থাকুক, আমার বন্ধুর সমস্ত মন প্রাণ জুড়ে এখন শুধু শতদ্রু শতদ্রু। সেখানে অন্য কারোর ঠাঁই হবে না'। তাচ্ছিল্যের সুরে জিৎ বলে, 'দেখাই যাক শেষ হাসিটা কে হাসে'।

এই নিয়ে ওদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে। এক ফাঁকে কখন যে মানালী কৃষ্ণার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, জিৎ খেয়াল করেনি। খেয়াল হতেই সে স্বাভাবিক ভাবে একটু লজ্জা পেয়ে গেল। কি জানি ওদের কথাবার্তা মানালী শুনতে পেল কিনা। পেলে ওর সম্পর্কে কি ধারণা হোল। কিন্তু কৃষ্ণা বরাবরই ক্রুকেড। জিৎকে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলার জন্য মানালীকে বলে, 'মানালী, জানিস তো আমাদের এই জিৎ বোস তোর বায়োডাটা চাইছিল। আমরা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছি এ স্বাদের ভাগ হবেনা। আমাদের বন্ধু আগাগোড়া মেডিকাল কেয়ারে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে'। কৃষ্ণার বলার ঢঙে মানালীর মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ে। হাসতে হাসতেই বলে, 'বলেছিস ভালই করেছিস। তবে ফ্রেন্ডশিপ করতে দোষটা কোথায়। কি বলেন আপনি'? বলে জিৎএর দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয় মানালী। অন্য যে কোনো ছেলে হলে একটু অপ্রস্তুত হয়ে যেত, মুখ দিয়ে বাক্যি বেরোতো না। কিন্তু জিৎ বরাবরই একস্ট্রা স্মার্ট। বিন্দুমাত্র ঘাবড়ে না গিয়ে বলে, 'আই অ্যাম ওভারহোয়েলমড। নাউ উই আর ফ্রেন্ডস্'। নিজের মোবাইল নাম্বারটা মানালীকে দেয়, 'কাইন্ডলি সেভ করে রাখবেন। মাঝে মাঝে আপনার কাছ থেকে ফোন আশা করবো, অ্যান্ড উই উইল স্পেন্ড অ্যা কোয়ালিটি টাইম'। কৃষ্ণা গোল গোল চোখ করে ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে থাকে। মানালী চোখের ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দেয় যে জিৎকে তার প্রথম দর্শনেই ভাল লেগেছে।

অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর মানালীকে সঙ্গে নিয়ে জিৎ বেরিয়ে এসে নিজের গাড়ির দরজা খুলে অনুরোধ করে উঠতে। মানালীর বাড়ির দীর্ঘ পথটা ওরা গল্পে মশগুল হয়ে রইল। মেয়েটা যে শুধু দেখতে সুন্দর তাই নয়, ওর বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তাও জিৎএর মন স্পর্শ করে। এত সহজ ও সাবলীল যে না মিশলে বোঝাই যেত না। মানালীকে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসার সময় মনে হোল এতক্ষণ সে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করছিল।

সেদিন অনেক রাত হয় জিৎএর বাড়ি ফিরতে। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না। না আসারই কথা। বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বসন্তের ফুরফুরে হাওয়া মুখে এসে ঝাপটা মারে। একটা সিগারেট ধরিয়ে আজকের সুখস্মৃতি রোমন্থন করতে লাগল। এতদিন ধরে যে নারীর ছবি সে মনের ক্যানভাসে এঁকেছে, মানালী বুঝি সেই নারী। সে যেন তার জন্যেই পৃথিবীতে জন্মেছে। কিন্তু অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস, যাও বা মনের মতন নারীর সন্ধান মিলল, তাও সে নারী বাঁধা পড়ে আছে এক ব্যস্ত ডাক্তারের হৃদয়ে। জিৎএর ভাগ্যের সঙ্গে এই নিষ্ঠুর খেলা কেন ? এই তো এবার অফিসে তার সিনিয়র ভিপি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রদ্ হয়ে গেল বসের খামখেয়ালীর জন্য। জিৎএর মতে বসের স্টাবর্ন অ্যাটিটুডই এর জন্য মূলত দায়ী। ওর সহকর্মী এবং বলতে গেলে অন্তরঙ্গ বন্ধু অনির্বাণ ওকে পরামর্শ দেয় আরো বেশি ডিপ্লোম্যাটিক হতে, অফিসে কাজ করতে গেলে যেটা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু জিৎ ভীষণ একরোখা। কারোর অন্যায় আচরণ সে সহ্য করতে পারেনা। মানালীর কথাটা ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা অন্য দিকে মোড় নিচ্ছে দেখে ঘরে ফিরে এসে বিছানায় গা এলিয়ে দেয় এবং ঘুম আসার আগ পর্যন্ত মানালীর কথা ভাবতে থাকে। মনে মনে অদেখা অচেনা ডঃ শতদ্রুকে প্রচন্ড ঈর্ষা করতে আরম্ভ করে। মানালীর মতন একজন সুন্দরী ও স্মার্ট মেয়ে যদি ওর জীবনসঙ্গিনী হোত তাহলে নিশ্চিতভাবে ওর জীবনের ছন্দই পাল্টে যেত। এসব ভাবতে ভাবতে চোখে ঘুম নেমে আসে।

সেইদিন মানালীর সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ার পর থেকেই জিৎ তার মনকে অনুশাসন করতে পারছে না। অফিসের কাজকর্ম সব পন্ড হবার যোগাড়। অনির্বাণের চোখে ওর বন্ধুর অস্বাভাবিকতা ধরা পড়ে যায়। জিৎকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে প্রথম প্রথম এড়িয়ে গেলেও, পীড়াপীড়ি করতে সব কবুল করে। অনির্বাণ যুক্তি দিয়ে ওকে বোঝানোর চেষ্টা করে যা পাওয়ার নয় সেই মায়াবী হরিণের পিছনে ধাওয়া করার অর্থ কী ? কিন্তু জিৎএর অবুঝ মন কিছুতেই মানতে চায় না। তার দৃঢ় বিশ্বাস মানালী ও সে মেইড ফর ইচ আদার। মাঝখানে শতদ্রু যেন একজন ইন্ট্রুডার। মানালীর মন জয় করার শক্তি তার আছে। তর্কের খাতিরে তার মধ্যে যদি কোনও খামতি থাকেও, সেটা পূরণ করতে সে পিছপা হবেনা। শতদ্রু প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার হতে পারে, কিন্তু সেই বা কম কিসে ? মাল্টিন্যাশনাল কম্পানিতে ভাল পোস্টে আছে। বয়স কম হওয়ার সুবাদে চাকরীতে উন্নতি করবার সুযোগও রয়েছে। তাছাড়া হাবেভাবে মনে হয়েছে মানালীরও তাকে অপছন্দ হয়নি।

সেদিন অফিসে জিৎএর একগাদা কাজ ছিল। মনে একরাশ বিরক্তি নিয়ে কাজগুলো কমপ্লিট করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোবাইলটা বেজে ওঠে। কানে দিয়ে 'হ্যালো' বলতেই ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'আমি মানালী বলছি। অফিস টাইমে ফোন করে আপনাকে বিরক্ত করলাম না তো'? 'নট অ্যাট অল', জিৎ জবাব দেয়। 'আপনি কি আজ সাতটার সময় গড়িয়াহাটের আনন্দমেলার সামনে আসতে পারবেন'? জানতে চায় মানালী। মানালী তার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, এর থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে। সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল। কিন্তু অনেক কষ্টে মনে উচ্ছ্বাস চেপে বলে, 'কোনও বিশেষ ব্যাপার'? 'টেলিফোনেই বলব ? সাক্ষাতে বললে হয় না'? জানতে চায় মানালী। জিৎ লজ্জা পেয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হবে না কেন? চিন্তা করবেন না, আমি যথাসময়ে পৌঁছে যাব'। মানালীর সঙ্গে কথা শেষ করে জিৎ অনুভব করে সে আর নিজের মধ্যে নেই। প্রথম চাকরী পাওয়ার দিন যেমন মনে আনন্দের ঢেউ খেলে গিয়েছিল, তেমনি আনন্দ সে আজ আবার অনুভব করল মানালীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনায়।

অন্য দিনের তুলনায় সেদিন একটু আগে বেরিয়ে গাড়ি চালিয়ে সে গড়িয়াহাটে এসে পৌঁছায়। আনন্দমেলার সামনে গিয়ে দেখে মানালী ওর আগেই পৌঁছে গেছে। পরণে দামী কাতান শাড়ী, ম্যাচিং ব্লাউজ, একটা সোনার লকেট। চুল খুলেই এসেছে। মানালীর দিক থেকে চোখ ফেরানো সম্ভব হচ্ছিল না। তাই দেখে মানালী একটু লজ্জা পেয়ে হেসে বলে, 'কি হোল, শুধু দেখবেন, না কোনও রেস্টুরান্টে গিয়ে বসবেন'।

'আই অ্যাম সরি। চলুন কোথাও বসি'। জিৎ মানালীকে নিয়ে সোজা চলে আসে ক্রিস্টাল চপস্টিক রেস্টুরান্টে। 'বলুন হঠাৎ তলব কেন'?

মানালী মৃদু হেসে বলে, 'বাব্বা, তর সইছে না দেখছি। বলছি সব কথা। আগে একটু গলা ভেজাতে দিন'। জিৎ লজ্জা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে বয়টাকে ডেকে দুটো সুইট লাইম সোডার অর্ডার দিল। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা এসে যায়। মানালী তাতে দু চুমুক দিয়ে জিৎএর দিকে তাকিয়ে বলে, 'একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই'।

'সাহায্য ? আমার ? বলুন কি সাহায্য করতে পারি'? জিৎ অবাক হয়ে জানতে চায়। মানালী কি বলবে বোধহয় আগে থেকে ঠিক করে এসেছিল। তাই বলতে সময় নিল না। 'আপনাকে একবার আমার সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ামে যেতে হবে'।

'ফোর্ট উইলিয়ামে কেন'? জিৎ অবাক হয়ে জানতে চায়। মানালী মুখটা নামিয়ে বলে, 'আপনাকে বলার সুযোগ হয় নি। আমার দাদা ইন্ডিয়ান আর্মিতে ছিল। বছর দুই আগে সীমান্ত এলাকায় জঙ্গীদের গুলিতে প্রাণ হারায়। মা'র পেনশন চালু হয়েছে, কিন্তু হিসেবে কিছু গরমিল হওয়ায় পেনশনের টাকা বাড়ানোর জন্য আমরা ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছিলাম। ওরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছে। ওদের অফিস থেকে ডেকে পাঠিয়েছে। আপনি সঙ্গে থাকলে একটু ভরসা পাই। তাই বলছিলাম যদি আপনি আমার সঙ্গে যান, খুব উপকৃত হব'।

জিৎ মনস্থির করতে বেশি সময় নিলনা। 'বলুন কবে যেতে চান? বাই দি বাই, আপনার দাদার নাম কি'? 'সৌম্য সেন', মানালী উত্তর দেয়।

কথামতো শুক্রবার জিৎ মানালীকে সঙ্গে নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামে গেল। অফিসার খুবই ভদ্র ও মার্জিত। চমৎকার কথাবার্তা। বললেন, "আমরা আপনার আবেদনপত্রটি দেখেছি। হ্যাঁ সত্যি, আমাদের হিসেবে কিছু ভুল বেরিয়েছে। অ্যাকাউন্টস্ ডিপার্টমেন্টকে নির্দ্দেশ দিয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি রিভাইজড পেনশন আপনার মার নামে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাইন্ডলি বিয়ার উইথ আস্, উই আর রিয়ালি স্যরি ফর দ্যা ইনকনভিনিয়েন্স"। কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর ওরা উঠে আসছিল। হঠাৎ অফিসার ভদ্রলোক জিৎ এর দিকে তাকিয়ে মানালীকে ফিসফিস করে কি একটা বললেন, জিৎ ঠিক শুনতে পায় না। তারপর আবার স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'এনিওয়ে রেস্ট অ্যাসিওরড কাজটা হয়ে যাবে'।

ফোর্ট উইলিয়াম থেকে বেরিয়ে এসে ওরা দুজন গাড়িতে উঠে বসে। সারাটা পথ ওদের দুজনের মধ্যে তেমন কোনও কথা হয়না। মানালী একবার শুধু বলে, 'আপনি থাকাতে আমার কাজটা খুব সহজে হয়ে গেল। মেনি থ্যাংকস্'। জিৎ উত্তরে শুধু 'নো মেনশন' বলে চুপ ক'রে থাকে। মানালীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে। মানালীর জন্য কাজটা করতে পেরে ওর ভালোই লেগেছে, কিন্তু কি একটা অজানা অনুভূতির চাপে একটু ক্লান্ত বোধ করে। নৈরাশ্যের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা সে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে, এবারও তার ব্যতিক্রম হল না। পরের দিন সকাল থেকেই আবার সব চলতে থাকে রুটিনমাফিক। তারই মধ্যে প্রতিদিনই ইচ্ছে হয় মানালীর সাথে একটু কথা বলার, কিন্তু কাজের চাপে নিজে থেকে আর ফোন করা হয়ে ওঠে না।

সপ্তাহখানেক যেতে না যেতেই মানালীর ফোন এলো জিৎএর কাছে। এবার ওদের বাড়িতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ। 'আপনার কোনও আপত্তি শুনবো না। আপনার সঙ্গে মার আলাপ করিয়ে দেব। সামনের রবিবার সন্ধ্যেবেলায় আমাদের বাড়িতে আসুন, আসতেই হবে কিন্তু। কথা দিন আসবেন'। মানালীর অনুরোধে জিৎ একবাক্যে রাজী হয়ে যায়। মনে মনে ভাবে মানালীর বাড়ী ঘুরে আসার পর কথাটা হাল্কা করে নিজের বাবাকে জানিয়ে রাখবে। ছোটবেলা থেকে বাবা ওকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে বড় করেছেন, তাই বাবার সাথে ও অনেক কথাই বলতে পারে।

পরের রবিবার সন্ধ্যের আগেই জিৎ পৌঁছে গেল মানালীদের সল্টলেকের বাড়ি। সুন্দর, ছিমছাম বাড়ী। আসবাবপত্র এবং তার বিন্যাসেও বেশ উন্নত রুচির পরিচয় স্পষ্ট ভাবে ফুটে উঠেছে। হঠাৎ মনে হল বাবা-মাও এখানে এলে খুশি হবেন। অল্প কথাবার্তার পর ডাক পড়লো খাওয়া দাওয়ার। এলাহি আয়োজন। মানালীর মা সামনে বসে থেকে খাওয়ার তদারকি করেন। গল্পগুজব করতে করতে জিৎ লক্ষ্য করে মানালীর মা থেকে থেকেই শাড়ীর আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন। মানালীও সেটা লক্ষ্য করে মাকে মৃদু ধমক দিয়ে বলল, 'কি হচ্ছে মা ? উনি আমাদের বাড়িতে প্রথম এলেন। কোথায় গল্প করবে তা না খালি চোখের জল ফেলছ'। মা লজ্জা পেয়ে চোখ মুছে বললেন, 'কেন জানিনা ওকে দেখে খোকার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দেখেছিস মানা, ওর চেহারার সঙ্গে খোকার চেহারার কত মিল'? মানালী কোনও উত্তর দেয়না। ভদ্রমহিলা জিৎকে বললেন, 'সময় সুযোগ পেলে আবার এসো বাবা, আমাদের খুব ভাল লাগবে'। জিৎ ঘাড়টা নেড়ে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, কিন্তু মুহূর্তের জন্য আনমনা হয়ে যায়। সেদিনের সেই অজানা অনুভূতিটাকে যেন দেখা গেল মনের জানালার বাইরে আবার উঁকি মারতে। ধীর পায়ে গাড়ির দিকে এগোতে থাকে, সঙ্গে মানালী। অন্ধকারে মানালীর মুখটা ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না, তবু মনে হল ও কিছু একটা বলতে চায়। কিছু একটা শোনার প্রতীক্ষা জিৎ এরই বা কি কম?

মানালীর দিকে তাকিয়ে জিৎ প্রশ্ন করে 'কিছু বলবে?' নিজের অজান্তেই 'আপনি' থেকে পৌঁছে গেছে 'তুমিতে'। একটু বাধবাধ গলায় উত্তর আসে,

'যেদিন কৃষ্ণাদের বাড়িতে আপনাকে প্রথম দেখেছি, সেদিন আমি চমকে উঠেছিলাম। আপনার চেহারার সাথে আমার দাদার চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। আমার দাদার কথাতো আপনি সব শুনেছেন। ভাই-বোনে খুব ভাব ছিল আমাদের। ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছি, সেই অভাব সর্বদাই দাদা মেটানোর চেষ্টা করতেন। জানেন দাদা আমাকে বলতেন, বাবা নেই তো কি হয়েছে, তোর সম্প্রদান আমিই করবো'। বলতে বলতে গলা ধরে আসে মানালীর। জিৎ-এর চোখে মুখে ফুটে ওঠে সমবেদনার অভিব্যক্তি।

কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতার পর আবার শুরু করে মানালী, 'শতদ্রুর সাথে আমার বিয়ের দিন স্থির হয়ে গিয়েছে। আমার খুব ইচ্ছা, আপনি যদি আমার সম্প্রদানটা করেন। আমার মনে হবে দাদাই যেন শুভ কাজটা করছে। মার ইচ্ছাও তাই। প্রথম দিন থেকেই আমি আপনার মধ্যে আমার দাদাকে খুঁজে পেয়েছিলাম। কিন্তু আপনাকে সে কথাটা কি করে বলবো বুঝে উঠতে পারি নি'।

কথাটা শুনে মুহূর্তের জন্য জিৎএর চোখের সামনেটা সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে যায়। দুঃখ, ক্ষোভ, হতাশা ও অভিমানের এক মিশ্রিত তরঙ্গ বয়ে যায় মনে। জিৎএর মুখ থেকে কোনো কথা বেরোয় না।

অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সামলে নেয় জিৎ। আগের অনুভূতিগুলো বদলে গিয়ে কর্তব্যবোধ উঁকি মারে মনে। জিৎ মানালীর হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে। খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে তারপর মুখ তুলে তাকায় মানালীর চোখে। চোখের ভাষায় বুঝিয়ে দেয়, কাজটা সে করবে। থাক না গোপন চিরদিনের জন্য তার অনুচ্চারিত ভালোবাসা। অন্ধকারেও সে লক্ষ্য করে, মানালীর চোখ দিয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো, আড়াল করার চেষ্টা করলো না মানালী।।

রঙ-বেরঙ

- গৌতম সরকার

ছোটবেলায় ছবি আঁকতে বেশ লাগতো। আরো বেশি ভালো লাগতো তাতে রঙ লাগাতে। রঙ-পেন্সিল আর প্যাস্টেল দিয়ে শুরু করলেও পরে জল-রঙই হয়ে উঠেছিল বেশি প্রিয়। আর ছিল রঙবেরঙের মার্বেল-পেপার। কাঁচি দিয়ে কেটে গঁদের আঠা দিয়ে ড্রয়িং-খাতায় সাঁটলেই তা হয়ে যেত ফুল, লতা, পাতা, হরিণ, খরগোস এবং আরও কত কি! এই ভালো লাগার শুরুটা ঠিক কবে বা কোথায়, তা জানি না। তবে এই প্রসঙ্গে যা মনে পড়ে তা হোল কোলকাতায় গোলপার্কের 'শিশু কল্যাণ' কিন্ডারগার্টেনে পড়াকালীন কিছু বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন ঘটনা।

খুবই 'বিচ্ছু' ছিলাম নার্সারি, কে.জি.বি. বা কে.জি.সি.-তে পড়াকালীন। অপেক্ষাকৃত কমবয়সী মিতা-আন্টি, শিপ্রা-আন্টি, শীলা-আন্টি বা হিমানি-আন্টিরা হিমসিম খেতেন আমায় সামলাতে। তাই প্রায়ই ডাক পড়ত মনি-আন্টির, যাকে নাকি সকলেই ভয় পায়! আমি দেখলাম এ আর এমন কি? শুধু কিছু পাকা চুল, কেমন যেন রোগা মতো আর বুড়ি মতো; একটু খিটখিটে, এই যা (তাঁর নাকিসুরের খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজটা আজও আমার কানে বাজে)! সুতরাং তিনিও কুপোকাৎ! মা যখন স্কুল-ফেরত আমাকে আর দাদাকে নিতে আসতেন তখন প্রায়ই আমার নামে কোন না কোন নালিশ লেগেই থাকত টিচারদের কাছ থেকে; মাকে অনেক সময়ই চোখের জল ফেলতে দেখেছি এই নিয়ে, স্কুল ফেরত বালিগঞ্জ গার্ডেন্সের রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে। মা বলতেন, "কেন, দাদার মত হতে পার না? কই, ওর জন্য তো আমায় কোনও কথা শুনতে হয় না"। কিন্তু কে কার কথা শোনে? আমার 'রাম-রাজত্ব' চলতেই থাকলো। একদিন কোন একজন টিচার বললেন যে "ক্লাসরুমে একে ঢিট করা যাবে না, ওকে নিচে অফিসে পাঠাও"। ঐটাই ছিল শেষ সম্বল – এক-তলায় হেড-মিস্ট্রেস অঞ্জলি-আন্টির "অফিস"!

তাই হোল। কে যেন আমায় তিন-তলার ক্লাসরুম থেকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে এলেন এক-তলার 'অফিসে'। দেখি সেখানে প্রায় আমারই সমান উঁচু প্রকাণ্ড এক টেবিলের উল্টোদিকে বসে আছেন তিনি - সেই অঞ্জলি-আন্টি। পাশেই কয়েকটা বিশাল বিশাল চেয়ার, আর দেওয়াল বরাবর সারি সারি বিশাল বিশাল কাঁচের আলমারিতে এইয়া মোটকা মোটকা সব বই - পরিবেশটা কেমন যেন থমথমে! এই কোঁকড়া-চুল ভদ্রমহিলাকে আমি আগেও দু-একবার দেখেছি; হাতা-কাটা ব্লাউজ, টিপ-সিঁদুর বা চুড়ি-বালার বালাই নেই। শুনেছি ইনি নাকি শুধুই ইংরিজিতে কথা বলেন আর শুধু বড়দের ক্লাসেই পড়ান; মানে দাদাদের কে.জি.সি.-তে। সাথের টিচারটি বেশ খানিকক্ষণ ধরে অঞ্জলি-আন্টির কাছে আমার 'সুখ্যাতি' করে আমার রিপোর্ট-কার্ডগুলো ওনার ঐ প্রকাণ্ড টেবিলটার ওপর জমা রেখে চলে গেলেন। যাবার পথে আমার দিকে একবার ফিরে তাকালেন; ভাবখানা এমন যে – দেখ এবার কেমন মজা!

অঞ্জলি-আন্টিকে দেখে তেমন কিছুই মনে হোল না, কিন্তু 'অফিসটাকেও' আমার ঠিক পছন্দ হোল না, পাশে এমন কেউই নেই যার সাথে খেলা (খুনসুটি) করা যেতে পারে। উনি ওনার ডান হাতের তর্জনী উঁচিয়ে "come" বলে আমায় ওনার কাছে ডাকলেন, আর তারপর কাছের বিশাল চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন "sit"। ক্লাসের সব টিচারই তো ইংরিজিতে কথা বলেন, কিন্তু অঞ্জলিআন্টির 'বাঁজখাই গলার ঐ ভারিক্কি ইংরিজিটা' শুনে কেমন যেন একটু ভয় করলো। বসা তো নয়, নিজের ছোট্ট পিছনটা কোন রকমে ঠেকিয়ে ঐ বিশাল চেয়ারটার গহ্বরে আত্মসমর্পণ করলাম।

চারদিক নিস্তব্ধ, শুধু 'অফিসের' সিলিং ফ্যানটার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে 'টিক-টিক-টিক-টিক' করে; আর তিন-তলা থেকে মৃদু ভাবে ভেসে আসছে শীলা-আন্টি আর মিতা-আন্টিদের গলার আওয়াজ – "চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই, ছেড়ে অলস মেজাজ, হবে শরীর ঝালাই" বা "আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলবো কী স্বত্বে, আমরা সবাই রাজা"। অঞ্জলি-আন্টি বেশ খানিকক্ষণ ধরে আমার রিপোর্ট-কার্ডগুলো উল্টে-পাল্টে দেখলেন। তারপর বললেন "কই, সবতো ঠিকই আছে দেখছি, তোমার তো সবই গোল্ড-কার্ড"! যত দূর মনে পড়ে, ক্লাসে সবচেয়ে বেশি 'পয়েন্টস' পেলে তবেই পাওয়া যেত ঐ 'গোল্ড-কার্ড'; তারপর 'সিলভার', 'ব্রোঞ্জ' আর একেবারেই কোন পড়া না পারলে জুটতো 'গ্রে'-কার্ড। আমি যে সব ক্লাসেই গোল্ড-কার্ড পাই তা আমার বেশ ভালমতোই জানা ছিল, তাই মনে মনে বললাম – তাহলে আমাকে এই 'অফিসে' শুধু শুধু আটকে রেখেছেন কেন? উনি জিজ্ঞেস করলেন "তুমি অন্যের মার্বেল-পেপার, প্যাস্টেল-কালার এইসব নাও কেন? এইসব তোমার চাই?" আমি বললাম "হ্যাঁ"। তারপর উনি জিজ্ঞেস করলেন "তুমি ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসো, তাই না"? আমি চুপ করেই থাকলাম; ভাবলাম ধুর ছাই, ছবি আঁকতে ভালবাসি কি না তা ছাতারমাথা আমি কি কোরে জানবো? ইচ্ছা হয়, তাই আঁকি – ব্যাস। তারপর উনি বললেন "তুমি 'জল-ছবি' কি তা জান"? আমি তখনো চুপ, উনি যে ঠিক কি বলছেন সেটাই বুঝতে পারলাম না। উনি বললেন যে "হ্যাঁ, জল দিয়েও ছবি আঁকা যায়, তা তুমি জান?" আমি ভাবলাম যে এ আবার কেমন কথা - পেন্সিল নেই, রবার নেই; শুধুই জল? কিন্তু কিছু বলতে সাহস হোল না তাই চুপ করেই বসে থাকলাম। তারপর উনি বললেন "দাঁড়াও, তোমাকে কিছু মজার জিনিস দেখাই"। বলে উনি পাশের একটা কাঁচের আলমারি থেকে কি সব বার করলেন। তারপর তা দেখিয়ে বললেন "এগুলোকে বলে 'ব্রাশ', 'পেইন্ট-ব্রাশ'"! আমি মনে মনে 'টুথ-ব্রাশের' সাথে এই ব্রাশগুলোর একটা তুলনা টানার চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু এ দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা যাবে বোলে তো মনে হোল না! অঞ্জলি-আন্টি বলে চললেন "এই 'ব্রাশ' জলে ডুবিয়েই রঙ করা যায়"। আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছিল না, জলের আবার রঙ হয় নাকি? উনি বোধহয় আমার মুখ দেখে তা ধরতে পারলেন, বললেন "তোমাকে আরও একটা মজার জিনিস দেখাই"। বলে ঐ আলমারি থেকেই বার করলেন একটা বাক্স, আর দেখালেন তার ভেতরের নানান রঙ। বোঝালেন যে কি করে সেই রঙ জলে মিশিয়ে 'জল-ছবি' বানানো যায়। বললেন যে "আমি এগুলো লন্ডন থেকে কিনে এনেছি, লন্ডন কোথায় তা তুমি জান"? আমি বললাম "হ্যাঁ, চিনি তো"! উনি বললেন "তাই, কি করে"? আমি বললাম "বা রে, আমার সোনাকাকু যে লন্ডনেই থাকে"। উনি বললেন 'থাকে' না, বল 'থাকেন'; গুরুজনদের সম্পর্কে ঐ ভাবেই কথা বলতে হয়"। আমি বললাম "আমার সোনাকাকু যে 'গোরুজন' তা আপনি জানলেন কি করে"? উনি বললেন "গুরুজন", "তোমার কাকু তোমার থেকে বয়েসে বড় কিনা, তাই"। তারপর বললেন "আজ যখন তোমার মা তোমাদের নিতে আসবেন, তখন তাঁকে একবার আমার সাথে দেখা করতে বোলো, কেমন"? তারপরই উনি ওনার টেবিলে রাখা বেলটা কিরিং-কিরিং করে বাজালেন, যাতে কেউ এসে আমাকে আবার তিন-তলার ক্লাসে ফেরত নিয়ে যান।

সেদিন, বা তার দু-একদিনের মধ্যেই কোন এক সন্ধ্যাবেলায় মা আমাকে গড়িয়াহাটের এক ষ্টেশনারী দোকানে নিয়ে গিয়ে একটা 'জল-রঙে'র বাক্স, আর আরও কিছু আঁকার সরঞ্জাম কিনে দিয়েছিলেন। বাড়ি ফেরার পথে 'আলেয়া' সিনেমা-হলের পেছন-গেটের গলিতে বললেন, "এগুলো দামী জিনিস, যত্ন করে রাখবে"। সেই চার বছর বয়েসেই রঙ-পেন্সিল আর প্যাস্টেল থেকে আমার উত্তরণ হোল 'জল-রঙে'। এরই সাথে আরো একটা জিনিসও বুঝতে শিখলাম - যে আমি আঁকতে আর তাতে রঙ লাগাতে ভালোবাসি।

'শিশুকল্যাণ' শেষ করে 'বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাইস্কুল'। আঁকা আর রঙ করা চলতেই থাকলো। এরই মধ্যে আমার ক্লাস-ওয়ানের শেষের দিকে এমন একটা 'শকিং' ঘটনা ঘটে গেল যার জেরটা আমি আজ এই মাঝ-চল্লিশেও ঠিকঠাক কাটিয়ে উঠতে পারিনি, হয়তো কোনদিনই পারব না! জানলাম যে বাবা শিলিগুড়ি থেকে এসেছেন মা, আর আমাদের তিন ভাইকে নিয়ে যেতে। এর আগে পর্যন্ত জানতাম যে বাবা যেখানে যেখানে পোস্টেড থাকতেন সেখানে নাকি মাকে ঠিক নিয়ে যাওয়া যায় না। তাই আমরা কোলকাতাতেই থাকতাম আমাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে; ঠাকুমা ('দিদি'), পিসি ('পিসিভাই') আর দুই কাকার ('নানা', 'কাকাই') সঙ্গে। বাবা শেষপর্যন্ত আমাদের নিয়ে একসাথে থাকতে পারবেন জেনে মনে আনন্দ আর ধরছিল না। কিন্তু একই দিনে সন্ধ্যেবেলার মধ্যেই সবকিছু কেমন যেন পাল্টে গেল যখন দেখলাম যে বাবা অঝোরে কাঁদতে থাকা মা আর ভাইকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠছেন স্টেশনে যাওয়ার উদ্দেশ্যে; দাদা আর আমাকে ফেলে রেখেই! যখন বুঝলাম যে কোন কান্নাকাটিই আমাদের সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা ওদের ধরে রাখবার জন্য যথেষ্ট নয় তখন আঁকড়ে ধরেছিলাম ঐ রঙ-তুলিকেই। পছন্দ মত কোন ছবি এঁকে, তাতে ইচ্ছে মত রঙ লাগাতে পারলে মনের দুঃখটা যেন কিছুটা হলেও কমতো।

তখন হাফ-প্যান্ট পড়া ছোট্ট 'ধনরাজ', 'সের্গেই' বা ফ্রক পড়া ছোট্ট 'তাতিয়ানা'দের ছবি আঁকলেই বেশ ভাব জমে যেতো আমার ওদের সঙ্গে; ওদের সাথেই তখন দিব্যি খেলা করতে পারতাম আমি --- শিলিগুড়ি-দার্জিলিং বা রাশিয়ার কোনও মাঠে। ভোরবেলায় ওরাই আমার ঘুম ভাঙ্গাতে

আসতো, আমি দিব্যি রাশিয়ান-ভাষায় কথা বলতে পারতাম; দোলনায় দোল খাওয়া আর ফুরফুরে হাওয়ায় ওড়া ঐ সোনালি চুলের 'তাতিয়ানা'কে আমার জড়িয়ে ধরে আদর করতে ইচ্ছে করতো, আর ঠিক তখনই নীল ফ্রক পড়া 'তাতিয়ানা' মিলিয়ে যেত আকাশের নীলে! ঘুম ভাঙার পর ভোরের বিছানায় স্কুলের গ্রীষ্মের-ছুটিতেও আমার ঠাণ্ডা লাগতো --- তখন পয়লা বৈশাখে বরফ পড়তো!

কিন্তু আঁকার বাইরে সময়টা কেমন যেন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল আমার কাছে, কোনো কিছুই আর তেমন ভাল লাগতো না। তখন দিদি, পিসিভাই মাঝে মাঝে দাদা আর আমাকে দিয়ে বাবার শিলিগুড়ির 'সেবক রোডের' ঠিকানায় চিঠি লেখাতেন; লিখতে বলতেন যে "আমরা এখানে রোজই রসগোল্লা খাচ্ছি"। এই ডাহা মিথ্যে কথাটার উদ্দেশ্য যে শুধুমাত্র বাবাকে জানান যে আমরা কোলকাতায় ভালো আছি, তা আমি বুঝতে পারতাম; কিন্তু কোলকাতায় আমি যে একেবারেই ভালো নেই তা বাবা-মাকে জানানোর কোনো উপায় আমার জানা ছিল না। আমার সাত বছর বয়েসের কোনো চাহিদাই বাড়িতে পূরণ হত না; পেটের খিদে মিটলেও মনের খিদের কিছুই মিটতো না। তাই পাড়ায়, স্কুলে দস্যিপনা করে বেড়াতাম। ফলস্বরূপ প্রায়ই স্কুলের কোনো না কোনো টিচার আমার ডায়েরিতে 'নোট' লিখে তা বাড়ির 'গার্জেনের' কাছ থেকে সই করিয়ে আনতে বলতেন - আপনার ছেলে আজ অমুকের মার্বেল-পেপার কেটেছে, আপনার ছেলে আজ তমুকের সেন্টেড-রবারটা নিয়ে নিজের পকেটে ভরেছে বা আপনার ছেলে কার ওয়াটার-বটলের সব জলই তার মাথায় ঢেলেছে! কিন্তু বাড়ির কেউই এইসব নোটের কথা জানতেও পারতেন না। টিচারদের নোটগুলো বাড়িতে দেখাতে সাহস পেতাম না; অফিস-ফেরত 'নানা'র মার, বা 'কাকাই'য়ের দেওয়া 'কঠিন শাস্তির' ভয়ে। আর 'দিদি','পিসিভাই'য়ের এই ব্যাপারে তেমন কিছু করার ছিল বলে আমার মনে হত না। তাই চলতেই থাকলো আমার দস্যিপনা --- কারো টিফিন-বক্স থেকে টিফিন খাওয়া, কারো পেন্সিল-বক্স থেকে পেন্সিল হাতড়ানো, কারো গঁদের আঠার পুরোটাই হাত সাফাই করা, এইসব। তাই প্রথম প্রথম যেতাম আমাদের বাড়ির রান্নার লোক 'তনু'-দির কাছে। ও লেখাপড়া জানত না, তাই হিজিবিজি কিছু একটা সই করে দিত আমার টিচারদের নোটের নিচে! তাতেই দিব্যি কাজ চলে যেত আমার। বিপদ হোল একটা ঘটনার পর, যখন বাবা বা মায়ের সইটা যে নিজেকেই 'জাল' করতে হবে তা ঠিক করতে বাধ্য হলাম; কারণ শুধু সইয়ে যে আর কাজ চলবে না, তা মালুম হোল। স্কুলে কোনো একজনের পেন্সিল-বক্স থেকে পেন্সিল-রবার বা পুরো পেন্সিল-বক্সটাই নিজের ব্যাগে পুরেছিলাম! ধরা পড়ার পর ক্লাসের টিচার মিনতি-দি আমার ডায়েরিতে 'নোট' লিখে মাকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মা তো শিলিগুড়িতে! 'তনু-দি'কে দিয়ে তো আর কাজ চলবে না! এখন কি করি? তাই নিজেই মিনতি-দির নোটের নিচে একটা উত্তর লিখে, মায়ের নামে সই করলাম। পরের দিন তা মিনতি-দিকে দেখাতে উনি ওনার চশমার পুরু লেন্সের ভেতর দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আমায় পরখ করলেন। চশমার ভিতরে মিনতি-দির ঐ অপেক্ষাকৃত বড় বড় চোখদুটোকে আমি আজও চোখ বুজলেই দেখতে পাই! আমি যে ধরা পড়ে গেছি তা তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, তাই ঐ চোখদুটোর দিকে আর খুব বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারনি। মিনতি-দি আমায় আমার ডেস্কে ফেরত যেতে বললেন, কিন্তু আমার ডায়েরিটা ফেরত দিলেন না। সেইদিনই কিছু পরে অন্য কোনও ক্লাস চলাকালীন জলধর-দা (যার কাজ ছিল ক্লাসে ক্লাসে 'নোটিস' খাতা নিয়ে টিচারদের কাছে যাওয়া) এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন 'টিচার্স-রুমে'। সেখানে গিয়ে দেখি যে রীতিমত একটা 'মিটিং' চলছে, আমাকে নিয়েই বোধহয়। কারণ সেখানে মিনতি-দি আমার সেই ডায়েরি হাতে বসে, আর তাঁকে ঘিরে মৃদুলা-দি, উমা-দি, ইন্দিরা-দি, বাসন্তি-দি, ছায়া-দি, মুনমুন-দি; এঁরা। ওনারা সবাই বেশ খাতির করে আমাকে বসালেন, কোথায় থাকি, বাড়িতে কে কে আছেন, বাড়িতে ফোন আছে কি না, বাড়ি থেকে স্কুলে কি ভাবে যাতায়াত করি, ইত্যাদি সব জেনে নিলেন। সেখানেও ধরা পড়ে গেলো আমার মিথ্যে – মা তো শিলিগুড়িতে; অথচ ডায়েরিতে 'মায়ের সই'! দেখলাম যে মিনতি-দি ওনার পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে সামনের টেবিলে রেখেছেন, আর ওনার চোখদুটো ভিজে! কিছু পরে আমার ডায়েরিটা ফেরত পেলাম, আর মুনমুন-দি বললেন "তোমার যদি কিছু লাগে তো আমায় বলবে, কি বলবে তো? You can just come to me, okay"? ডায়েরিটা শেষমেশ ফেরত পেয়ে 'বিপদটা' কেটে গেছে বুঝে, মহা আনন্দে তারপর আমার ক্লাসে ফিরলাম। ফেরার পথে মনে হোল যে চশমা ছাড়া মিনতি-দির চোখদুটো তো বেশ ছোটোই, তাহলে চশমা পড়লে তা অতো বড় দেখায় কেন?

এইসব লজ্জার মাঝেও একটু আরাম খুঁজে পেতাম ঐ রঙ আর তুলির স্পর্শে। স্কুলের মর্নিং-সেকসনের দিলীপ-বাবুর (দাস), ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর সাদা চকে আঁকা 'একটি গ্রামের দৃশ্যের চিত্র' আমার প্রথম প্রথম ভালো লাগলেও পরে তা একঘেয়ে লাগতো। সেই একঘেয়েমি থেকে রক্ষা পেলাম মুনমুন-দির (সেন) আঁকার ক্লাসে। টিচার্স-রুমের 'ঐ মিটিঙের' সুবাদে ক্লাসের বাইরেও ওনার সঙ্গে তো আলাপ ছিলই, আর ওনার ভাবভঙ্গি বা কথা বলার ঢংও আমায় কেমন যেন আকর্ষণ করতো! যদিও উনি যে সুচিত্রা সেনের মেয়ে বা 'সুচিত্রা সেন' যে কি 'বস্তু' তা জানা বা বোঝার কোনও ক্ষমতাই তখন আমার ছিল না! শুধু দেখতাম যে স্কুল ফেরত ছেলেদের নিতে আসা সমবেত মায়েদের কেউ কেউ আমাদের আঁকার টিচারকে দেখার জন্য একটু উৎসুক।

মুনমুন-দির ড্রয়িং ক্লাসেরও কেমন যেন একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল! জানলার পাশে দাঁড়িয়ে উনি একবার বলেছিলেন "এই ধর আমার ছবি আঁকতে হবে; কিন্তু ঐ যে 'ওয়ালে' আমার 'স্যাডো' পড়েছে, সেটাও কিন্তু আমি, তাই ওকেও কিন্তু আঁকতে হবে"! ছায়ারও যে ছবি আঁকা সম্ভব তা এর আগে আমার জানা ছিল না, শুনে আমি একেবারে 'হাঁ' হয়ে গেছিলাম! একবার মুনমুনদি আমাদের ক্লাসে কিছু একটা আঁকতে বলেছিলেন, আর উনি ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন যে আমরা কে কেমন আঁকছি। হঠাৎ দেখি যে উনি আমার ডেস্কের পাশে এসে চুপটি করে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন "বাঃ, বেশ 'ড্র' করো তো তুমি! তুমি বুঝি ড্রয়িং 'লাইক' করো?" ততদিনে আমি বেশ ভালো মতোই জেনে ফেলেছি যে আমি আঁকতে পছন্দ করি – তাই মাথা নাড়িয়ে বললাম হ্যাঁ। তারপর উনি বললেন "তোমার এই ড্রয়িংটা তুমি আমায় দেবে"? আমি উত্তর দেওয়ার আগেই বললেন "না, এটা 'বেটার' তুমি তোমার বাড়ি নিয়ে যাও, কিন্তু আমার জন্য কিছু একটা 'স্পেসাল' ড্র করে এনো, শুধু আমার জন্য, কি পারবে তো"? সেদিন দুপুরেই বাড়ি ফিরে আমি ওনার জন্য একটা "স্পেসাল" ছবি এঁকেছিলাম; আনন্দবাজারের প্রথম পাতার ভেতরের দিকের নিচের কোনায় ধারাবাহিক ভাবে বেরনো 'অরণ্যদেব' কার্টুন থেকে অরণ্যদেবের বৌ 'ডায়ানা'র ছবি; 'কপি' কোরে, কিন্তু একটু বড় কোরে। পরের দিন ক্লাসে ওটা মুনমুন-দিকে দিতেই উনি খুব খুশি হলেন, আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন "বাঃ, একে তো একদম আমার মতো দেখতে, just like me"! বদলে উনি আমাকে দিয়েছিলেন একটা প্লাস্টিকের গোলাপ ফুল, যা আমার কাছে আজও আছে! এর বছর কয়েক বাদে 'ঐ' মুনমুন-দিকেই বৃষ্টিতে ভিজে-কাপড়ে অযথা মাটিতে গড়াগড়ি খেতে দেখেছি টি.ভি বা সিনেমা-হলের পর্দায়, দেখে একেবারেই ভালো লাগেনি; গায়ে কাপড় জড়ানো, কোনও রকম প্রসাধনহীন আমার 'সেই' আঁকার টিচার মুনমুন-দি আজও আমার মনের 'ফ্রেমে' বন্দী – আর ঢের বেশী আকর্ষণীয়!

ক্রমে 'ধনরাজ'-'সের্গেই'-'তাতিয়ানা'রা হারিয়ে গেলো, আর স্কুলের মর্নিং-সেকশন পার করে আমি গেলাম ডে-সেকশনে। কেমন যেন একটা 'বড় বড়' হাবভাব, হাঁটা-চলার ধরণটাই যেন বদলে গেলো সবার! কিন্তু 'ছোট'বেলার অভ্যাস আঁকা আর রঙ করাটা ছাড়তে পারলাম না তখনও, বরং তা আরও বেড়েই গেলো। এরই মাঝে মা 'চলে গেলেন' আমার ক্লাস-সিক্সের গ্রীষ্মের-ছুটিতেই। ঐ নিঃসঙ্গতার মধ্যেও 'সঙ্গ' পেয়েছিলাম রঙ-তুলির। মাঝে-সাঝেই রঙগুলোকে আর তেমন রঙিন মনে হতো না, শুধু 'লাল' আকাশের সূর্যোদয় বা সূর্যাস্ত দেখতেই ভালো লাগতো, মনে হতো যে মা কি তাহলে গেলেন ঐ দিকেই কোথাও? সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের ছবি আঁকতেও ভালো লাগতো তখন। কয়েকবার এদিক-ওদিক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় তা এঁকেওছিলাম, ধোপে টেঁকেনি কোনোটাতেই। তবে এই প্রসঙ্গে যা মনে আছে তা হোল আমার দাদার একবার আমাকে নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে কোনো এক 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাওয়ার কথা, আমি যখন ক্লাস সেভেন বা এইটে পড়ি তখন – যে দাদাই কিনা ছোটবেলায় ঝগড়া-মারামারি হলেই জল ঢেলে দিয়ে, বা অন্য কোনোও ভাবে আমার আঁকা নষ্ট করে দিত!

এইরকমই কোনও এক সময় (ক্লাস সেভেন বা এইটে হবে) আমি একবার এক সূর্যাস্তের দৃশ্য পেইন্ট করেছিলাম, একটা গ্রিটিং-কার্ডের ওপর। কি করে বা সেই কথা পৌঁছেছিল আমাদের পাড়ার আমার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড় 'মিঠু'-দির কানে ('যে' মিঠু-দির গান শুনতে আমি আজও টিকিট কাটতে রাজী আছি)! আঁকাটা দেখাতে মিঠু-দি কিছুতেই বিশ্বাসই করতে পারলো না যে ওটা আমার দ্বারা পেইন্ট করা সম্ভব, বলল "ধ্যাৎ, এটা তো কোনও 'পাকা' হাতের আঁকা"! শুনে প্রথমে খারাপ লাগলেও পরে মনে হয়েছিলো তাহলে কি আমার আঁকার-হাতটা বেশ 'পাকা'?

এরই মাঝে পাশের বাড়ির 'বুড়ন'-দির বিয়ে ঠিক হয়ে গেলো, কোনও অঙ্ক আটকে গেলেই 'যে' বুড়ন-দির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে করতো! বুড়ন-দির বাড়ির ছাদের ছাদনা-তলায় আলপনা দিতে, আর বিয়ের পিঁড়িতে রঙিন-কাগজ সাঁটতে আমার ডাক পড়েছিল বুড়ন-দির দাদা 'অমল'-দার কাছ থেকে। সাথে অমল-দা সমেত ওঁদের আত্মীয়দের মধ্যে থেকে আরও বেশ কয়েকজন ছেলে-ছোকরাও ছিল। একসময় অমল-দা বলল "দেখ, দেখ, গৌতমতো মাটি থেকে হাতই তোলে না, কি রকম 'এক টানে' আঁকছে সব"। শুনে ভালো লেগেছিল এই কারণে যে অমল-দা নিজেও ভালো আঁকে বা আঁকত (অমল-দার আঁকা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটা ছবি এখনও আমার চোখে লেগে আছে!)। এসব ছাড়াও পাড়া বা স্কুলের ম্যাগাজিনের পাতা ছবিতে ভরাতে মাঝেসাঝেই ডাক পড়তো আমার।

স্কুলের ক্লাস এইটে আমাদের অঙ্কের আর 'লাইফ-সায়েন্সের' ক্লাস নিতেন সুরেশ-বাবু (পাল)। একবার 'লাইফ-সায়েন্সের' ক্লাসে তিনি আমাদের ব্যাঙের 'রিপ্রোডাকটিভ-সাইকেল' সম্পর্কে কিছু একটা লিখতে বলেছিলেন। আমি আর কি লিখবো? পড়াশোনাই তো করতাম না, তখন তো স্কুলে যাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল কেবলমাত্র বন্ধুদের সাথে 'জমিয়ে' আড্ডা মারা। শুধু মনে পড়লো যে জল থেকে ডাঙায় উঠে ব্যাঙাচি হয়ে যায় ব্যাঙ! চুপচাপ বসেও থাকা যায় না। তাই একটা ছবি এঁকে সুরেশ-বাবুর কাছে খাতা জমা দিলাম – এক ব্যাঙের ঘাড়ে বসে আর এক ব্যাঙ! নিজের 'বিদ্যা জাহির' করতে ছবিটাতে আবার 'লেবেলিংও' করে দিয়েছিলাম --- নিচেরটা পুরুষ, ওপরেরটা স্ত্রী (ভুল বশত)। পরের দিন সুরেশ-বাবু একরকম ছুঁড়েই আমার 'বঙ্গলিপি' খাতাটা আমায় ফেরত দিয়ে বললেন যে "এটা 'ড্রয়িং' ক্লাস না; তুই এমনই একটা বান্দর-পুলা যে তুই তো সেইডাও ঠিকঠাক করস নাই – 'লেবেলিংটা'ও তো ঠিক হয় নাই"! নিজের 'লেবেলিং'এর ভুল বুঝতে পেরে, সুরেশ বাবুর সামনে হাসি চাপতে গিয়ে পেট আমার একেবারে ফেটে যাচ্ছিলো!

একবার কথা হচ্ছিলো ক্লাসের এক সহপাঠীর (শৈবাল গুপ্ত) সঙ্গে, যে কিনা লেক-মার্কেটের দিকে 'চিত্রাংশু'তে আঁকা শিখতো। খোঁজখবর নিয়ে বাবাকে চিত্রাংশুতে আমার আঁকা শেখার ইচ্ছাটার কথা জানালাম, ভর্তিও হোলাম সেখানে। কিন্তু মাস খানেকের বেশি টিঁকতে পারলাম না, কারণ বাড়ির দু-একজনের পছন্দ হোল না ব্যাপারটা। আমার কাকু (নানা) 'বিধান' দিলেন যে "গান-আঁকা, এসব তো মেয়েরা শেখে – বিয়ের বাজারে দাম 'তোলার' জন্য, এসব শিখে আমার কি হবে"? তাছাড়া বাড়িতে তো অন্যান্যরাও আছে, আমিই বা একলা এই সুযোগটা পাব কেন? হক কথা! তাই নিজের ইচ্ছেটাকেও 'তুলেই' রাখতে হোল, শুধু একটু অন্যভাবে। এরপর বিভিন্ন ব্যস্ততায় আঁকা বা রঙ করার অভ্যাসটাই হারিয়ে গেল আমার। এর বছরখানেক বাদে নানা বা বাড়ির অন্য কাউকে না জানিয়েই ভর্তি হয়েছিলাম গানের স্কুলে, ভবানিপুরের 'গীতবিতানে'; 'ইন্দিরা' সিনেমা-হলের পিছন দিকে। সেখানে গান শিখতাম সেখানকারই প্রাক্তন শ্রদ্ধেয় অনুপ ঘোষালের ছাত্র, আর এক প্রাক্তন 'মাল্লার'-দার কাছে। আমার এই 'অ্যাডভেঞ্চারে' সাহায্য পেয়েছিলাম আমার সহপাঠী-বন্ধু সুমন্ত (চক্রবর্তী) আর ওর মাসীর ('মোটামাসী') কাছ থেকে, সুমন্তও গান শিখত ঐ গীতবিতানেই।

এরপর যা টিঁকে থাকল তা হোল পুজোর আগে কিছুদিন বাদে বাদেই কুমারটুলিতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটানো। একাই যেতাম, আর দেখতাম যে বাঁশ, কাঠ, খড়, মাটি ধীরে ধীরে কেমন সব জীবন্ত হয়ে উঠছে! পরে সেইসব ঠাকুরই আবার বিভিন্ন প্যান্ডেলে দেখে কেমন যেন এক আজব অনুভূতি হতো, মনে হতো যে এঁদের সব্বাইকেই আমি শুধু চিনিই না – জানিও! ছোটবেলায় আঁকা কোনও কোনও গ্রাম, বাড়ি, ছাদ, হরিণ বা মানুষদের সাথেও আমার এইরকমই কোনো এক সম্পর্ক স্থাপন হয়ে যেতো, ঠিক যেমনটা হয়েছিলো ঐ শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙের ছোট্ট 'ধনরাজ' বা রাশিয়ার সেই ছোট্ট 'সের্গেই'-'তাতিয়ানাদের' সঙ্গে!

অ্যামেরিকায় আসার পর গ্র্যাজুয়েট-স্কুলে থাকাকালীন আমার সখ হয়েছিলো 'রিসার্চের' ফাঁকে একটু অন্য কিছু করার, দিনরাত আমার NMR-ল্যাবরেটরির একঘেয়েমি থেকে রেহাই পেতেই! এক-ইঞ্জিনের আর দুই আসনের প্লেন ওড়ানো শেখাটাই (ফ্লাইং লেসন) ছিল প্রথম আর প্রধান ইচ্ছা। রিসার্চ করার দৌলতে 'স্টেট এমপ্লয়ি' হবার সুবাদে, আমার 'স্টেট ইউনিভার্সিটির' ফ্লাইং ক্লাসে অতি নগণ্য টিউশন-ফিয়ে সেই মত রেজিস্ট্রেশানও করেছিলাম; কিন্তু একজনের বিশেষ বাধাতে শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না । অগত্যা বাছলাম পেইন্টিং-ক্লাস। সেখানেই আমার প্রথম তেল-রঙে 'হাতেখড়ি', মাঝ-কুড়ির 'বুড়ো' বয়েসে। সেই ক্লাসের ইন্সট্রাকটার (টিম ওরউইগ) একবার আমায় জিজ্ঞেস করেছিলেন যে "have you ever considered taking art a bit more seriously"? জবাবে আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম যে না, 'আর্ট'টা শুধু 'করতে'ই ভালোবাসি, তা নিয়ে 'আর্ট-স্কুলে' গিয়ে পড়াশোনা করতে নয়; ঠিক যেমন রান্নাটা। ওটা শুধু 'করতে'ই ভালোবাসি, তা নিয়ে 'কালিন্যারি-স্কুলে' গিয়ে পড়াশোনা করতে নয়। তবে হ্যাঁ, 'গান'টা কোনো স্কুলে শিখতে পারলে মন্দ হতো না!। এই 'অয়েল-পেইন্টিং' ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক 'যুৎসই' হোল না, ছোটবেলার 'সেই জল-রঙের' মজাটাই পেলাম না এতে। তার ওপর ছিল 'গ্রেডে'র ঝামেলা – 'মজা' তো নয়, আঁকার ক্লাসে কে কি গ্রেড পেল সেটাও প্রাধান্য পেল। আমার কাছে আঁকাটা ছিল 'পার্সোনাল', নিজের ভালো লাগাটাই ছিল এক এবং একমাত্র বিবেচ্য, কে কি ভাবলো তার তোয়াক্কা না করেই! অনেক সময়ই আঁকার থেকেও বড় হয়ে উঠত 'আঁকার সময়' আমি যে 'জগতে' বাস করি – 'সেই জগতটা'। অ্যামেরিকান ইউনিভার্সিটির কোনো 'রেজিস্টার্ড ক্লাসে' তা বোধহয় হবার নয়। সাথে ছিল 'টাইম-কন্সট্রেইন্ট' - একটা নির্দিষ্ট আঁকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করার বাধ্যবাধকতা। ছোটবেলার দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যে পার কোরে দেওয়া 'সেই' আঁকতে পারার কোনো মজাই ছিল না এতে, তাই নিজের ধৈর্যের অভাবটাও নজরে এলো। ছবি রঙ করতে গিয়ে দেখলাম যে আমার সময়টাই কেমন যেন 'বেরঙ' হয়ে যাচ্ছে! হিতে বিপরীত হচ্ছে দেখে এতই বিরক্ত লাগলো যে সময় থাকতে থাকতে ড্রপই করে দিলাম ক্লাসটা, যাতে আমার ট্র্যান্সক্রিপ্টে এই ক্লাসের 'সেই' 'গ্রেড'টার আর কোনও উল্লেখই না থাকে!

'মজা'টা আবার খানিক ফেরত পেয়েছিলাম বেশ বছর কয়েক বাদে, আমার বাচ্চাদের সাথে; ঐ জল-রঙ আর তুলির হাত ধরেই। ওদের সাথেই আবার নিজের ছোটবেলায় ফেরত যেতাম কখনো কখনো। কাগজের ওপর আমার পেন্সিলের কোনো ছোট্ট আঁচড়ে, বা জল-রঙের তুলির কোনো অলস টানেও ওরা অবাক হয়ে যেত; চোখ বড় বড় করে এমন ভাবে তাকাত যে আমার নিজের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যেত – 'ঐ' মুনমুন-দির আঁকার ক্লাসে 'ছায়ার' ছবি আঁকতে গিয়ে আমার যেমন দশা হয়েছিলো! ওরা কে আমার কোন আঁকাটা নিজের কাছে রাখবে তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি লাগিয়ে দিতো; যার মধ্যে থাকতো না 'মিঠু'দির অবিশ্বাসের অবজ্ঞা, দাদার জল-ঢালার অবহেলা বা সুরেশবাবুর খাতা ছোঁড়ার তাচ্ছিল্য; বদলে আমার মনে পড়ে যেত 'অমলদা'র উৎসাহ, 'মুনমুন'দির আদর বা মায়ের 'সেই যত্ন' - যা দিয়ে মা কিনে দিয়েছিলেন আমার প্রথম জল-রঙের বাক্স আর বলেছিলেন তা 'যত্ন' করে রাখতে। পেরিয়ে আসা কত বছর, সাক্ষী হওয়া কত ঘটনা মিলেমিশে কেমন যেন সব একাকার হয়ে যেত – অনেকটা ঐ জলে রঙ মেশানোর মতই, সম্বিত ফিরে পেতাম ওদেরই কারো প্রশ্নে – "how did I do Baba?" ঝাপসা-চোখে ওদের আঁকা ভালো করে না দেখেই বলতাম "awesome, marvelous!" প্রশংসা শুনে ওরা আনন্দে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠত! তারপর ওরাও বড় হয়ে গেলো, আর বিভিন্ন ব্যস্ততায় হারিয়ে গেলো ওদের ছবি আঁকা বা রঙ করার অভ্যাসটাও; সাথে আমারও, আবারও। ■

ক্ষুদ্‌দা ও বৌদির দীর্ঘ বিতর্ক

- অনুপম গুপ্ত

ক্ষুদ্‌দার সঙ্গে মানে ক্ষুদিরাম চাকলাদারের সঙ্গে রমলা বৌদির প্রায়ই খুনসুটি হয়। তর্ক বিতর্ক লেগেই থাকে। তবে মতান্তর কখনই মনান্তরে পৌঁছয় না। মোটামুটি তিরিশ চল্লিশ মিনিটের মধ্যেই মধুরেণ সমাপয়েৎ হয়ে যায়।

আসলে বৌদির বাড়ী উত্তর কোলকাতার আহিড়ীটোলা স্ট্রীটে। শৈশব, কৈশোর বা যৌবন সবই উত্তর কোলকাতার নস্টালজিয়ায় আচ্ছন্ন। ক্ষুদ্‌দার বাড়ী দক্ষিণ কোলকাতার বকুলবাগান রোডে। নস্টালজিয়ার ব্যাপারে ক্ষুদ্‌দাও ব্যতিক্রমী নন।

সেদিন একটা তর্কের জন্য একটা দীর্ঘ ঘরোয়া বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। বিষয় – "উত্তর কোলকাতার বনেদিয়ানা অস্তমিত"। উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ দেশী, প্রবাসী বাঙ্গালী পরিজন। সঞ্চালনের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত সঞ্চালক গৌরব গাঙ্গুলী এবং বিচারক ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক অমরেশ মজুমদার।

সঞ্চালক গৌরব গাঙ্গুলী জানালেন, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করার জন্য উপস্থিত শ্রোতাবন্ধুদেরও ইনভলভ্ করানো উচিত। উৎসাহিত এবং ইচ্ছুক শ্রোতাবন্ধু হাত তুলে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বলার সুযোগ পাবেন। প্রথমেই সঞ্চালক --- "ফর দ্যা মোশন্"এ ক্ষুদ্‌দাকে বলতে বললেন।

'ফর দ্যা মোশন্'এ ক্ষুদ্‌দা মানে উত্তর কোলকাতার বিপক্ষে বা দক্ষিণ কোলকাতার পক্ষে বললেন--- জব চার্নক হুগলী নদীর পূর্ব পাড়ে নেমেছিলেন এবং তিনটি গ্রাম বা মৌজা কিনেছিলেন। সেই থেকে উত্তর কোলকাতার বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু দুঃখের বিষয় শুধু আমিরী চালে চলে আর পায়রা উড়িয়ে উত্তর কোলকাতার বাবুরা দিন কাটিয়ে দিলেন। মারুতি গাড়ীর জ্ঞাতি ভাইয়েরা ফিটন গাড়ীকে হটিয়ে দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু কোথায় গেল ছবি বিশ্বাসের চুনোট করা ধুতি, হাতে বেলফুলের মালা এবং ভোর রাত্রে স্খলিত চরণে বাড়ী ফেরার দৃশ্য? "একদিন রাত্রে" সিনেমাতে ছবি বিশ্বাস ছিলেন সমগ্র উত্তর কোলকাতার লোকেদের প্রতিভূ। ভাল কি খারাপ সেটা অন্য কথা, কিন্তু এই বাবু কালচার নিয়েই তো ওনারা দম্ভ করতেন। ভাবতে অবাক লাগে নরেন্দ্রনাথ এই কালচারের আগুনে পুড়ে যাননি। নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হয়ে শিকাগো শহরের ধর্মসভায় বক্তৃতা দিয়ে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

সঞ্চালক --- তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান না বলে ব্রাদার্স অ্যান্ড সিসটারস্ বলেছিলেন। আমাদের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু'ও বলতেন 'ভাইয়ো অউর বহেনো'। যাক্, ক্ষুদিরাম বাবু আপনি বলুন।

ক্ষুদ্‌দা --- ভাগ্যিস চিত্তরঞ্জন এভিনিউ'র ওপর একটা বাজার আছে যার নাম ছাতুবাবুর বাজার এবং এখানে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে চড়ক মেলা হওয়ার জন্য লোকে এখনও ছাতুবাবুর নাম মনে রেখেছে। আর লাটুবাবুর নাম তো মুছেই গেছে। উত্তর কোলকাতার গোটাকয়েক রাস্তা ব্যতীত অন্যান্য রাস্তার চেহারা পলাশী যুদ্ধের সময় যা ছিল এখনও ঠিক সেরকমই আছে। লর্ড ক্লাইভও কোনো ইন্টারেস্ট নেননি। বলরাম দে স্ট্রিট বা বেনিয়াটোলা লেনের বাসিন্দাদের সূর্য বা চাঁদের আলো কেমন দেখতে হয়, তার খুব একটা ধারণা আছে কি ? বেগম আক্তার কি সেই জন্যেই সমগ্র উত্তর কোলকাতার বাসিন্দাদের হয়ে মনের দুঃখের গান গেয়েছেন, "জোছনা করেছে আড়ি, আসেনা আমার বাড়ী"।

জোছনাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই, সে বেচারা আসবে কি করে ? বাড়ীর দু পাশে চার ফুট ছাড় দেওয়ার আইন তো তখন চালুই হয়নি। পুরোনো জিনিস একটু অদল-বদল করে নতুন কিছু করার মানসিকতাই নেই। পাতাল রেলের কাজ কিন্তু দক্ষিণেই শুরু হয়।

সঞ্চালক একটা ছোট্ট চা বিরতি ঘোষণা করলেন। বিরতির পরে "অ্যাগেইনস্ট দ্যা মোশন"এ মানে উত্তর কোলকাতার পক্ষে এবং দক্ষিণ কোলকাতার বিপক্ষে রমলা বৌদিকে বলতে বলা হোল।

রমলা বৌদি --- জব চার্নক এখানে নোঙ্গর না করে আর একটু এগিয়ে দক্ষিণ দিকে নোঙ্গর ফেললেই তো পারতেন। কালীঘাটের মন্দির আর কিছু ডাকাত ছাড়া আর কি ছিল সেখানে ? চুনোট করা ধুতি পরতে গেলে বুকের পাটার দরকার। সেটা কি ওনাদের আছে ? ওনাদের আছে হয় সাহেবী পোষাক আর নয়তো গান্ধীজির পোষাক। আমাদের মহিলাদের পোষাকের জন্য যতটা কাপড় দরকার ততটা কাপড় দিয়ে পোষাক বা ব্লাউজ বানানো হয়। দক্ষিণ কোলকাতার মহিলাদের ব্লাউজ বানানোর সময় দর্জিদের খুব সতর্ক থাকতে হয়, কারণ কাপড় কাটার সময় ওদের আঙ্গুল নাকি প্রায়ই কেটে যায়। অবশ্য মহিলাদের ঘাড়ে পেটে পিঠে আলো হাওয়া লাগানো স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল হলে সেটা আলাদা কথা।

সঞ্চালক --- একজন শ্রোতা কিছু বলার জন্য হাত তুলেছেন। হ্যাঁ, বলুন !

শ্রোতা -- আমি অরবিন্দ ঘোষাল, কলেজ স্ট্রীট থেকে বলছি। সর্বজনীন দুর্গাপুজো এখান থেকেই শুরু হয়। বাগবাজার, সিমলা ব্যায়াম সমিতি, কলেজ স্টীটের দূর্গাপুজো ঐতিহ্যমণ্ডিত সেটা সবাই জানেন। অথচ দক্ষিণে গিয়ে দেখুন, তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা, রাজস্থানের দিলওয়ারা টেম্পল, আঁখের ছিবড়ের প্যাণ্ডেল --অদ্ভুত ব্যাপার ! এ কি মায়ের পুজো, নাকি আধুনিক শিল্প প্রদর্শনের এক কুৎসিত প্রতিযোগিতা?

রমলা বৌদি --- এখানে বিদ্যার পীঠস্থানে আছে পুরনো এবং নামী বিদ্যালয়। ওখানে আছে কিছু হাল ফ্যাসনের স্কুল। একটার নাম আবার "দক্ষিণ বিন্দু", যার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই ১০ হাজারের বেশী। সঠিক নাম হওয়া উচিত, "দক্ষিণ বিন্দু প্রাইভেট লিমিটেড"। সুকুমার রায়ের ট্যাশগরু বানানোর উন্নত মানের যন্ত্র ব্যাঙের ছাতার মতো ক্রমশ গজিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ কোলকাতায় বাঙ্গালী খুঁজতে গেলে শক্তিশালী দূরবীন দরকার।

ভাগ্যিস বিভক্ত বঙ্গের পদ্মাপাড়ের কিছু পূর্ববঙ্গীয় এখানে এসে দক্ষিণ কোলকাতায় বাঙ্গালীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। যদিও ওনাদের উচ্চারণে 'র' আর 'ড়'এর কোনো তফাৎ খুঁজে পাওয়া যায় না। ওনারা 'স'কে 'ছ' এবং 'ছ'কে' 'স' বলেন।

সঞ্চালক -- হ্যাঁ, আপনি কিছু বলবেন ?

শ্রোতা – হ্যাঁ, আমি বাঘাযতীন থেকে ডঃ দীপক লাহিড়ী বলছি। কাল বিকেলে আমার চেম্বারে এক মহিলা রুগী বললেন, 'ডাক্তার বাবু, আমার ব্লাড ছুগার কিছুতেই কমছে না''।

সঞ্চালক – তার মানে বাসে লেডিস ছিট না থাকলে উনি বাসে ওঠেন না। (হাসিতে ঘর ফেটে গেল)

সঞ্চালক গৌরব গাঙ্গুলী আবার রমলা বৌদিকে পরবর্তী অংশ বলার জন্য অনুরোধ করলেন।

রমলা বৌদি – কোলকাতার বনেদিয়ানা এবং বাঙ্গালীয়ানা তো উত্তর কোলকাতাই ধরে রেখেছে। রাজেন মল্লিক নেই তো কি হয়েছে, তাঁর সংগ্রহশালা তো আছে। কই সেখানে তো কোনো প্রোমোটারকে দিয়ে বহুতল বাড়ী বানানো হয়নি। আমরা আমাদের 'বাপ-পিতামো'র ভিটেতে কাউকে ঢুকতে দিইনি। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে দুর্গাপুজোয় এখনও নীলকণ্ঠ পাখীর প্রয়োজন হয়। দক্ষিণের শ্রদ্ধেয় বাসিন্দারা নিশ্চয়ই নীলকণ্ঠ পাখী দেখে থাকবেন, তবে সেটা ছবির বইতে। আশু মুখুজ্জে এবং সুভাষ বোসের বাড়ী রিসার্চ ইনস্টিটিউ-এ পরিণত হয়েছে, তাই পুরোনো স্মৃতি এখনও বর্তমান। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ী তো হাসপাতাল এবং বহুতল বাড়ীতে আত্মসমর্পন করেছে। 'হাজার টাকার ঝাড়বাতি' উত্তর কোলকাতার বনেদি বাড়ীতে এখনও পাওয়া যাবে, কিন্তু ওনাদের বাড়ীতে, স্যরি ফ্ল্যাটে ঝাড়বাতি টাঙ্গাবেন কি করে ? যা নীচু সিলিং, যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

সঞ্চালক – তার মানে উত্তর কোলকাতার বাবুরা বলতে চাইছেন "মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নই"। উপস্থিত সকলের সঙ্গে সঞ্চালকও হাসলেন এবং ক্ষুদ্‌দাকে ফর দ্যা মোশনের পরবর্তী অংশ বলতে অনুরোধ করলেন।

ক্ষুদ্‌দা – আমাদের উচ্চারণে দোষ আছে, ঠিক কথা, সেটা কিন্তু পদ্মাপাড়ের লোকেদের জন্য। কিন্তু ওনারা তো বাইরে থেকে কাউকে ঢুকতে দেননি। তাহলে 'নুচি' 'নেবু' 'নঙ্কা'তে 'ল' কেন ঢুকতেই পারছে না ? 'গেলুম' 'খেলুম' আর বাঘের হালুম কি খুব কাছাকাছি ? এখনও কেন 'শ' আর 'স'তে কোনো তফাৎ নেই?

সঞ্চালক – sam বাজারের sosi বাবু sosa খেয়েছেন, কিন্তু sasorire sarge গেছেন কিনা প্রেস মিডিয়া এখনো জানাচ্ছে না। অবশ্য পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বিখ্যাত সাহিত্যিক পরশুরামও লিখেছেন 'হয়, হয়, zanti পার না। ঠিক আছে, ক্ষুদিরাম বাবু, আপনি বলুন।

ক্ষুদ্‌দা – রক্ষণশীল কথাটা শুনতে খুব ভাল। পুরো কাপড়টাই লেগে যায় ব্লাউজ বানাতে, তাই না ? হেদুয়াতে কি শুধু বুড়োরাই বসে ? হীরের আংটিটা দেওয়া হয়েছিল বলেই তো বাঈজির নাকছাবি জ্বল জ্বল করছে, সেটা সবাই জানে, কিন্তু যেটা জানেনা তা হচ্ছে পরবর্তী বংশধরদের বাজার করার পয়সা আছে তো ? ভূতনাথও নেই যে উত্তর দেবে।

সঞ্চালক রমলা বৌদিকে আত্মপক্ষ সমর্থনে অর্থাৎ উত্তর কোলকাতার পক্ষে শেষ বক্তব্য বলার জন্য আহ্বান করলেন।

রমলা বৌদি – ওনারা কি গঙ্গানদী দেখেছেন ? দেখেছেন তো টালির নালা, জোয়ার ভাটাতেও নির্বিকার। যাইহোক, ওই গঙ্গা নদীতে কত লোকে কত কিছু ফেলে, তাতে কি নদীর পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে ? মার্গারেট নোবেল অর্থাৎ সিসটার নিবেদিতা কিন্তু এখানেই থাকতেন। ঈশ্বরচন্দ্র কি এখানকার বাঈজি নাচের হুল্লোড় দেখে রাগ করে মেদিনীপুর চলে গিয়েছিলেন ? মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র যখন নিজের বাড়ীতে স্টেজ বেঁধে পরিবারের পুরুষ মহিলাদের নিয়ে 'বাল্মীকি প্রতিভা' অনুষ্ঠান করেছিলেন, কই তখন তো গেল গেল রব ওঠেনি?

সান্ধ্য মজলিশের বিতর্ক সভা বেশ জমে উঠেছে। কিন্তু সভা শেষ করতেই হবে। সঞ্চালক গৌরব গাঙ্গুলী সাহিত্যিক অমরেশ মজুমদারকে অনুরোধ করলেন বিতর্কের জয়-পরাজয় ঘোষণা করার জন্য।

বিচারক সাহিত্যিক অমরেশ মজুমদার -- কালের বিবর্তনে সবই পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন মেনে নিতে না পারলে বাস্তববিমুখ হয়ে পড়তে হয়। চিত্তরঞ্জন এভিনিউ'র পূর্বতন নাম ছিল সেন্ট্রাল এভিনিউ, এটা সকলেই জানেন, কিন্তু জগন্নাথ ঘাট রোড যে বিবেকানন্দ রোড হয়েছে, সেটা কি কারোর মনে আছে ? গড়ের মাঠে মেমসাহেবরা হাওয়া খেতে যেতেন। সেই গড়ের মাঠের অঙ্গচ্ছেদ ক'রে বিড়লা তারামণ্ডল, রবীন্দ্রসদন, নন্দন হয়নি ? তার জন্য কি কোনো আন্দোলন, পথ অবরোধ হয়েছে ? হগ্ মার্কেটের জৌলুস কি নিউ মার্কেট ধরে রাখতে পেরেছে ? স্থানীয় উদ্ধত হকারদের অত্যাচারে পূর্বতন হগ্ মার্কেটের করুণ দৃশ্য দেখে আকাশ থেকে হগ্ সাহেব দু ফোঁটা চোখের জল ফেললেও ফেলতে পারেন। সাহেবদের প্রিয় রাস্তা পার্ক স্ট্রীট'এ এখন উঠতি দেশী সাহেবদের দেখা যায় যাদের হিপ্ পকেটে আগাথা ক্রিস্টির বই আর মুখে জ্যাকসন – ম্যাডোনা'র গান। নৈশভোজের পর ফিটন গাড়ীতে চড়ে সাহেব, মেমরা হাওয়া খেতে যেতেন। আর এখন দেখা যায় রঙীন জলের উষ্ণ নেশায় বাতানুকূল গাড়ীতে চড়ে রাস্তা থেকে সুন্দরীদের জোর করে তুলে নেওয়ার কাপুরুষোচিত কাজ। দক্ষিণ কোলকাতার মনোহর পুকুর রোডে কি একটাও পুকুর দেখতে পাওয়া যাবে ? ঋষি অরবিন্দের মর্মর মূর্তি বসানো হোল ভিক্টোরিয়ার সামনে, অর্থাৎ রাতের অন্ধকারে যেখানে নানা রকম সমাজবিরুদ্ধ ক্রিয়াকলাপ হয়। উনি কি তাদের পাহারা দেবেন, নাকি উৎসাহিত করবেন ? নজরুল মঞ্চ কিন্তু বানানো হয়েছে ঢাকুরিয়া লেকের জমিতেই।

সব কিছু ঠিক করে করতে গেলে আবার শেষ থেকেই শুরু করতে হয়, অর্থাৎ লর্ড ক্লাইভ, ওয়ারেন হেস্টিংস, উইন্সটন চার্চিল, মাউন্ট ব্যাটনদের ফিরিয়ে আনতে হবে। দক্ষিণ কোলকাতা মানে রসার মাঠ ডিঙ্গিয়ে কালীমন্দিরে যেতে হত। সেখানে আবার রঘু ডাকাতদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সাহেবদের প্রিয় শহর Calcutta, কোলকাতা হয়ে গেল তার জন্য একটা বাংলা বন্ধ হয়েছে কি? লাইট হাউস সিনেমা হলে কি আর কোনওদিন 'টেন কম্যান্ডমেন্টস্' হবে? মেট্রো সিনেমার প্রেক্ষাগৃহের সাতফুট লম্বা গেটকিপারের কোনো রিপ্লেসমেন্ট হয়েছে কি ? উজ্জ্বলা, ভারতী বা পূর্ণ হল'এর কথা না বলাই ভাল। এসব মেনে নিতেই হবে। সমগ্র কোলকাতাবাসীর কাছে আলোচ্য বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বনেদিয়ানার রূপ পাল্টেছে, কিন্তু অস্তমিত হয়নি। এই শহরের রূপান্তর উত্তর-দক্ষিণ নিয়েই।

সঞ্চালক বললেন, 'বিতর্ক সভা শেষ হইয়াও শেষ হইলো না'। কারণ তেতাল্লিশ বছর আগে আহিড়ীটোলা স্ট্রীট থেকে রমলা বিগ্রহকে এনে বকুলবাগান রোডের বাড়ীতে এই ক্ষুদিরাম চাকলাদারই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহান পরাজয়ের এটাই মহিমা। ■

জীবনের রং

- মঞ্জুলিকা হানারি (দাশগুপ্ত)

ছোট গ্রাম কোয়ানো। গ্রামের একদিক ঘিরে আছে পাহাড়ের সারি। ছোট ছোট পাহাড়, খুব উঁচু নয়। তবে বিপদ আপদের হাত থেকে নানাভাবে গ্রামটাকে রক্ষা করে চলেছে সেই আবহমান কাল থেকে। এই পাহাড়ের জন্যেই শীতের হিমেল হাওয়া ততটা তীব্রভাবে পৌঁছতে পারেনা গ্রামে। আবার টাইফুনের দৌরাত্ম্যও অনেকটাই ম্লান। ঝড়-জল হয় ঠিকই, তবে তার জন্য ধ্বস নামা বা গাছপালা বাড়ীঘর ভেঙ্গে পড়ে প্রাণহানির ঘটনা আজ পর্যন্ত নেই।

ওই পাহাড়ের সারির কোনো একটা থেকে নেমে এসেছে ছোট নদী মিসোগি। ছোট, কিন্তু খরস্রোতা। গ্রামের ভিতর দিয়ে চঞ্চলা কিশোরীর মতন নাচতে নাচতে ছুটে চলেছে সে। তার চলার পথে মাঝে মাঝে কোন এক সময় ভূমিকম্পের সঙ্গে নেমে আসা বড় বড় পাথরের চাঁই। তাতে বাধা পেয়ে সে যেন আরও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। তার আনন্দের সেই কলধ্বনি সারা গ্রামকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখের সাথী এই নদী গ্রামের প্রাণকেন্দ্র, ভালবাসার ধন।

পাহাড় আর এই নদীর দৌলতে কোয়ানো গ্রাম ছবির মতন সুন্দর। সবুজে সবুজ চারিদিক। আছে ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির রং বদলের শোভা। শীতের ধূসরতাও তাকে ছুঁতে পারেনা। সেইসঙ্গে আছে নানা রঙের ফুলের বাহার, তা সে যত্ন করে লাগানোই হোক বা বনজই হোক। ঋতুর পরিবর্তন মনে প্রাণে অনুভব করা যায় এখানে। জনসংখ্যা কম বলে সকলেই সকলের পরিচিত। প্রয়োজনে তাই আপনজনের মতন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার লোকের অভাব নেই। সারা গ্রামটাই যেন একটা পরিবার।

এই গ্রামেই থাকেন তামিকো তোরিগোয়ে। ৯০এর প্রথম ধাপে পা রেখেছেন, কিন্তু চলনে বলনে এতটুকু বয়সের ছাপ পড়েনি। শুধু তাই নয়, চোখে চশমা বা বাঁধানো দাঁতও নেই তার। চলাফেরার জন্য লাঠিরও দরকার পড়েনা। নিজের ক্ষেতের কাজটাও নিজেই করেন। শুধু ধানচাষের কাজটা আর পারেন না। সেটা চলে গ্রামের সকলের সাহায্যে। মনে মনে বড় কুণ্ঠা বোধ করেন। সকলেই ব্যস্ত নিজের নিজের কাজ নিয়ে, তারই মধ্যে সময় ঠিক করে পালা করে ওঁর কাজটা করে দেয়। উনি জানেন সকলে ওঁকে ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। তাই নিজে থেকেই ভালবেসে সকলে ওর কাজটা করে ---তবুও।

ওঁর দুই ছেলেরই কিছুদিনের মধ্যে গ্রামে ফিরে এসে সব কিছুর ভার নেওয়ার কথা। সেই ভরসাতেই দিন কাটছে তাঁর। এমনিতেও তারা পালা করে যাতায়াত করে। মেয়েও সংসারের সব কাজ সামলে মাসে একবার করে চলে আসে দিন কয়েকের জন্যে। তাই সারাটা মাসই কেউ না কেউ থাকে ওঁর কাছে। কোন কারণে যে সময়টাতে ছেলেরা বা মেয়ে আসতে পারেনা সকলের ব্যবস্থায় গ্রামের কেউ না কেউ রাতে ওঁর সাথে থাকে। ওঁর হাজার আপত্তি ধোপে টেঁকেনা সকলের ভালবাসার কাছে।

ক'দিন ধরে শরীরটা ভাল নেই। বিছানায় শুয়ে বন্ধ কাঁচের জানালার দিকে তাকিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিলেন তামিকো। বাইরে তখন টাইফুনের তাণ্ডব। অঝোর ধারায় বিরামহীন বৃষ্টি পড়ছে, থামার কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু সেদিকে কোন খেয়াল নেই তাঁর। এসব দিনগুলিতে মনটা হাতের বাইরে চলে যায়। ডুবে যেতে চায় পুরনো সব ভোলা-না ভোলা স্মৃতিতে। আর সেসবে নিজের অজান্তেই বিভোর হয়ে পড়েন। ভাল-মন্দ কত শত স্মৃতি ! তারই মধ্যে হঠাৎ ব্যথার জায়গায় হোঁচট খায় মন।

মনে পড়ে যায় স্বামী হিরোশির কথা। কোথায় যে হারিয়ে গেল মানুষটা, হাজার চিন্তা করেও কুল পান না। দেখতে দেখতে কত বছর যে পার হয়ে গেল। কত বছর হোল --- ১০ বছর নাকি ১৫ বছর ? হিসাব মেলে না। এক সকালে শহরে কাজ আছে বলে সেই যে বেরোলো আর ফিরলো না। কত খোঁজ করেছেন। সামান্য সম্ভাবনায় ছুটে গিয়েছেন কত জায়গায়, কিন্ত সবই বিফলে। হিরোশির কোন খবর নেই। বেঁচে আছে কিনা কে জানে ! সেই থেকে আজও চলেছে দীর্ঘ প্রতীক্ষা। এই বিপদের সময় গ্রামের সকলে যে ভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা ভোলার নয়। অনেকেই সন্দেহ করে উত্তর কোরিয়ার এজেন্টরা হয়তো হিরোশিকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। অসম্ভব নয়, তা হতেই পারে। এ ধরণের ঘটনা তো ঘটেছেই। অনেককেই জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছে। কিছু লোক ফিরে এসেছে, আবার অনেকেরই কোনও খোঁজ নেই। তারা যে উত্তর কোরিয়াতে আছে, সে গুজব চারদিকে। যারা ফিরে আসতে পেরেছে, তাদের কাছে কিছু খবর পাওয়া গেছে। হিরোশি কি সেখানে বন্দী ? ওঁর মতন স্নেহময়, দরদী, দায়িত্বশীল মানুষ কাউকে কিছু না বলে নিঃশব্দে কোথাও চলে যাবেন ভাবা যায় না। মনে মনে গুমরে ওঠেন তামিকো। অনেক বছর তো হয়ে গেল, আর কি দেখা হবে ? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চোখের জল মোছেন।

একটা স্মৃতির টানে আরও অনেক স্মৃতি ভিড় করে আসে মনে। মন আবার ডুব দেয় স্মৃতির অতলে। হাতড়াতে হাতড়াতে পৌঁছে যায় এই গ্রামে আসার সময়টাতে। সে কি আজকের কথা ! মনে করতে পারেন না কত বছর আগে। ৫০ – ৬০ বছর হয়তো হবে। তখন জাপানের অনেক অঞ্চলেই গ্রামে লোকাভাব। তরুণরা সব শহরের আকর্ষণে গ্রামছাড়া। চাষবাস করার মতন পরিশ্রমের কাজ করতে তাদের মন চায়না। ফলে বেশীর ভাগ গ্রামেই শুধু প্রৌঢ় আর বয়স্করা রয়ে গিয়েছেন। সরকারের টনক নড়ে। এভাবে চললে চাষাবাদ সব বন্ধ হয়ে অদূর ভবিষ্যতে সব গ্রামই বৃদ্ধাশ্রম হয়ে উঠবে। এর বিহিত না করলেই নয়। আর তা যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভাল। তখন নানা অঞ্চলে শুরু হয় লোক আকর্ষণ করার জন্য নানান পরিকল্পনা। তরুণরা তো বটেই, সেই সঙ্গে বিশেষ ক'রে লক্ষ্য হোল শিশুসন্তান আছে এমন সব পরিবার। গ্রামে এসে বসবাস করার জন্য নানা সুযোগ সুবিধার প্রতিশ্রুতি। সেই সময় কোয়ানো গ্রামের পরিকল্পনা ও প্রতিশ্রুতি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অদূর ভবিষ্যতে টোকিও ছাড়ার কথা তখন তাদের মনে। টোকিও ছাড়তে হলে এমন জায়গাতে যাওয়াই ভাল বলে মনে হয়েছিল। নানা কারণে টোকিও ছাড়ার চিন্তা ওরা করছিলেন। বিশেষ করে ছেলেদের জন্য। বিয়ের পর বেশ কয়েক বছর চাকরির জন্য ওরা ওকিনাওয়াতে ছিলেন। তামিকো ওকিনাওয়ারই মেয়ে। স্বামী হিরোশি ছিলেন উত্তর জাপানের হোক্কাইদোর। ওদের কিভাবে দেখা হয়েছিল আর বিয়ে হয়, সে আরেক কাহিনী। টোকিওতে যখন আসেন ততদিনে ওদের জমজ দুই ছেলের বয়স ৬ বছর। প্রাইমারী স্কুলে যাওয়ার বয়স। টোকিও'র স্কুলে ভর্তি হোল তারা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আর স্কুলে যেতে চায়না। কারণ স্কুলের ছেলেরা বিদেশী বলে ওদের পেছনে লাগে। ওদের কথায় আর উচ্চারণে বিদেশী টান। ভাষাও পুরোপুরি টোকিওর মত না। মুস্কিলে পড়লেন তামিকোরা। স্কুলের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হোল, কিন্তু পুরোপুরি নয়। মনে পড়ে ওরা যখন ছেলেদের সমস্যা নিয়ে দিশাহারা অবস্থায়, তখন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা গভীর সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। আর সেই কারণেই কোয়ানো গ্রামে আসাটা হঠাৎই হয়ে যায়।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে বন্ধু ফুমিকোর হাসিভরা সুন্দর মুখ। ফুমিকো ছিলেন তামিকোর প্রাণের বন্ধু। শুধু বন্ধু নয়, ছোট বোনের মতন। দুজনে প্রায় সমান বয়সী। তামিকো একটু বড়। ফুমিকোর স্বামী আকিরা কিতাজিমা ছিলেন তামিকোর স্বামী হিরোশির ছোটবেলার বন্ধু। বলতে গেলে বংশ পরম্পরায় বন্ধুত্ব। ওদের বাবা কাকারাও বন্ধু ছিলেন। একই গ্রামে জন্ম দুজনের। পরে শহরে এসে একই স্কুলে, একই ক্লাশে। কলেজ, ইউনিভার্সিটিতেও তাই। পরে কাজের খাতিরে বেশ কিছুদিনের জন্যে দুজনে দু জায়গায়। তারপর টোকিওতে বদলী হয়ে এসে আবার পুনর্মিলন। ততদিনে আকিরা বিয়ে করেছেন। তার দুই ছেলে তামিকোদের ছেলেদের বয়সী। আর একটি মেয়ে। সে অনেক ছোট --- বছর কয়েকের হবে। দেখতে দেখতে দুই পরিবারে গভীর বন্ধুত্ব। টোকিও'র দমবন্ধ করা দিনগুলিতে এই বন্ধুত্বতে একটা মুক্তির স্বাদ ছিল তামিকোর কাছে। আকিরার স্ত্রী ফুমিকো ছিল হাসিখুশি প্রাণবন্ত এক মেয়ে। তামিকোর সঙ্গে ভাব হতে সময় নেয়নি। একসঙ্গে প্রচুর ঘোরাঘুরি করেছেন। কত জায়গায় গিয়েছেন। কেনাকাটাও করেছেন। গরমের ছুটিতে একবার সকলে মিলে তামিকোর বাপের বাড়ী ওকিনাওয়াতে গিয়েছেন। আবার ফুমিকোর বাপের বাড়ী মাৎসুশিমাতে সকলে মিলে ঘুরে এসেছেন। ছুটি পড়লেই দুই পরিবার একসঙ্গে বেরিয়ে পড়তেন গাড়ী নিয়ে শহর থেকে দূরে কোথাও। কখনও পাহাড়ে, কখনও সমুদ্রের ধারে, আবার কখনও বা গ্রামাঞ্চলে। দুই পরিবারের কর্তারই বেড়াবার নেশা ছিল। কি আনন্দেই না দিনগুলি কেটেছে ! তখনও বিদেশে যাবার চল ছিল না। বিদেশী মুদ্রার ব্যাপারে কড়াকড়ি ছিল। ওরা তাই চাইতেন ছেলেমেয়েরা নিজের দেশটাকে আগে ভাল করে দেখুক। পুরো দেশটাকেই প্রায় চষে ফেলেছিলেন ওরা। বেশ কাটছিল দিনগুলি। কিতাজিমাদের ছেলেদের স্কুলেও একই সমস্যা ছিল। তারা বিদেশী না হলেও কথায় আঞ্চলিক টান। তাই কিতাজিমারাও রাজী হয়ে যান একসঙ্গে কোয়ানো গ্রামে যেতে। নানান ব্যবস্থা করতে কিছুটা সময় লাগবে। তাই ঠিক হয় বছর-শেষে কোয়ানোতে যাবেন। নতুন বছর

দিয়েই শুরু হবে নতুন জীবন। ভবিষ্যতের নানা জল্পনা-কল্পনা করে যাবার দিনের আশায় উন্মুখ হয়ে দিন কাটছিল। কিন্তু সব পরিকল্পনাকে বানচাল করে এলো সেই বিভীষিকায় ভরা দিনটা। সেই দিনটার কথা ভাবলে আজও তামিকোর চোখে জল আসে। ব্যথায় মন ভরে যায়।

সময়টা ছিল শরতকাল। একটা বিয়েতে যোগ দিতে কিতাজিমারা গাড়ীতে মিতো গিয়েছিলেন। জায়গাটা টোকিও থেকে গাড়ীতে কয়েক ঘন্টার পথ। ফেরার পথে একটা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাদের গাড়ীর। ছোট্ট মেয়ে সাকুরা ছাড়া কিতাজিমা পরিবারের আর কেউ বাঁচেনি। অজ্ঞান অবস্থায় তাকে পাওয়া যায় তার মায়ের বুকের কাছে। মেয়েকে বাঁচাতে ফুমিকো সম্ভবত তাকে জড়িয়ে ধরে শরীর দিয়ে আড়াল করার চেষ্টা করে। তাতেই সাকুরা বেঁচে যায়। তবে ভাল রকম আঘাত লেগেছিল তার। হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এবার সমস্যা হয় হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তাকে কার কাছে রাখা হবে? কে দেখাশোনা করবে? কে দায়িত্ব নেবে? কেউই রাজী নয়। আত্মীয়স্বজনেরা যখন দায় এড়াতে ব্যস্ত, তখন ক্ষুব্ধ তামিকো আর হিরোশি এগিয়ে আসেন তার দায়িত্ব নিতে। সাকুরা প্রায় জন্ম থেকেই তাদের দেখছে। তাই তামিকোকে আঁকড়ে ধরে প্রথম থেকেই। আত্মীয়স্বজনদের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হলেও মেয়ে পেয়ে মনে মনে খুশী হলেন তামিকো। সেই থেকে সাকুরা মেয়ের মতনই মানুষ হয়েছে তামিকো, হিরোশির কাছে। ছেলেরাও তাকে ছোট বোনের মতন দেখে। নানা আব্দার সহ্য করে।

সাকুরাকে কাছে নেবার পর পরই ওঁরা টোকিও ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিতাজিমারা থাকাতে দুই পরিবার একসঙ্গে সব কিছু করে দিন কাটিয়েছে। কোয়ানো গ্রামে একসঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনাও তো ছিল। কি হয়ে গেল মাঝখান থেকে। ওঁদের অভাবে যে বিরাট এক শূন্যতার সৃষ্টি হোল সেটা তামিকো কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। তাই বছর-শেষের জন্যে অপেক্ষা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে এসেছিলেন কোয়ানোতে। গ্রামে স্কুল নেই, তাই ঠিক হয় গ্রামের কাছে বড় শহর আওতার স্কুলে তারা যাবে। গ্রাম থেকে ১০/১৫ কিলোমিটার দূরে সে শহর। গাড়ীতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন গ্রাম প্রধান। আর পিছন ফিরে তাকান নি ওঁরা। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গেই আরও কয়েকটা পরিবার গ্রামে আসেন। ফলে অল্প বয়সী পরিবারের সংখ্যা কিছু বাড়লো। সেইসঙ্গে যোগ হোল নানা বয়সী বাচ্চারা। অনেক দিন পরে গ্রামে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাসি-হুল্লোড়। নতুনদের সস্নেহে কাছে টেনে নেন প্রবীণরা। এর পর সকলের আদর ভালবাসায় নতুন জায়গায় মানিয়ে নিতে সময় নেয় নি। গ্রামের থেকে প্রতিশ্রুতি মতন চাষের জমি পেয়ে তা তৈরি করতে কিছুটা সময় গেছে। হাতে ধরে সকলে সব কিছু শিখিয়েছেন, উপদেশ দিয়েছেন। এসময়টাতে সকলের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছেন তা ভোলার না। ভুলবেন না স্বামী হিরোশি নিখোঁজ হওয়ার পরে সকলের সহযোগিতা। ওঁকে এক দণ্ড একা ছাড়েনি কেউ। ছেলেদের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের সকলে ছুটোছুটি করেছেন হিরোশিকে খুঁজতে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে নতুন করে ব্যথায় মনটা ভরে ওঠে। আপন মনে কাঁদতে থাকেন। কতক্ষণ এভাবে কেটেছে জানেন না। টেলিফোনের শব্দে সচকিত হয়ে চোখের জল মুছে তা তুলতেই ওপাশ থেকে ভেসে আসে মেয়ের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ---

মা, এই ঝড়জলে কি করছো ? কেমন আছ ? সব ঠিক আছে তো ? তুমি কি একা ? গ্রামের কেউ কি এসেছে থাকতে ?

এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে যায় সাকুরা। মেয়েকে আশ্বাস দেন তামিকো ---

ভাল আছি, চিন্তা করিস না। আমি একা নই। আজ রাতে থাকবে বলে তোমোকোরা সকলে এসেছে।

নিজের অসুস্থতার খবরটা আর দেন না। যা পাগল মেয়ে ! শুনলে হয়তো এই ঝড়জল মাথায় করে এসে হাজির হবে। তারপর কিছুক্ষণ কথা বলে ওঁকে বার বার সাবধানে থাকতে বলে সে ফোন রাখলো। ফোন ছেড়ে মৃদু হাসেন তামিকো। এই সেই সাকুরা --- আকিরা আর ফুমিকোর মেয়ে। ওঁদের মৃত্যুর পরে ছোট্ট যে শিশুকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন। স্বামী, ছেলে, মেয়ে, শ্বশুর শ্বাশুরীকে নিয়ে সে রীতিমতন সংসারী এখন। এই মেয়ে বিয়ের প্রস্তাব পেয়েও তামিকোকে একা রেখে যেতে হবে বলে বিয়ে করতে রাজী হয়নি প্রথমে। অনেক বুঝিয়ে তাকে রাজী করান তামিকো। মেয়েটা বড় ভাল হয়েছে। মায়ের মতনই হাসিখুশী প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। মন তাঁর প্রসন্নতায় ভরে ওঠে। এতক্ষণ যে ব্যথায় মনটা ভরেছিল তা কেটে যায় নিমেষে। এমন সুন্দর মেয়ের জন্যে মনে মনে বন্ধু ফুমিকোকে কৃতজ্ঞতা জানান তামিকো।।

স্বচ্ছ ভারত

- কৌশিক ভট্টাচার্য্য

রাস্তার এক কোণে
উপছে পড়া জঞ্জাল
তার সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে দাঁড়িয়ে।
নাকে হাত রেখে
তার পাশ দিয়ে চলে যায় পরিষ্কার লোকেরা।

কোনো ময়লা নেই তাদের শরীরে বা মনে।।

রান্নাবান্না

- চম্পা চক্রবর্তী

আমার কাছে রন্ধন সেই আবেশ. সেই নিষ্ঠা, সেই শিল্প চেতনা যা আমায় পূর্ণতা দেয়। তাই এবারো সাজিয়ে দিলাম কিছু পোশাকী ও ঘরোয়া খাবার যা একদিকে যেমন ঐতিহ্য, আভিজাত্যে শ্রেষ্ঠ অন্যদিকে স্বাদের এক উজ্জ্বল পরিভাষা হয়ে বিরাজিত। এর মধ্যে কিছু পদ দুর্গা পূজার ভোগ হিসাবেও সমাদৃত। তবে সময়ের সাথে সাথে এই অনবদ্য পদগুলি লুপ্ত প্রায়। তাই বাঙালীয়ানার সেই ১৬আনা গৌরব আবার ফেরাতে আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস।

বোয়াল মাছের ভাঙা

(আড় মাছ দিয়েও রান্নাটি করা যায়)

উপকরণ- বোয়াল মাছ-৫০০ গ্রাম (টুকরো করা মাছ), সরষের তেল-পরিমাণ মাফিক, মেথি-শুকনোলঙ্কা (ফোড়ন হিসাবে ব্যবহৃত), আদা-৫০গ্রাম, গোটা কাঁচালঙ্কা-৪টি,হলুদ-২চা চামচ,ঝালের গুঁড়ো-১ চা চামচ, স্বাদমতন-লবণ, আলু-২টি,বেগুন-১টি, ঝিঙে-৩টি, উচ্ছে-১টি, পটল-৩টি, কালো সরষে-১০গ্রাম, ময়দাগুঁড়ো-সামান্য, ঝোলে গুলে দেওয়ার জন্য।

প্রণালী- প্রথমে তরকারি গুলি কুচি কুচি করে কেটে রাখা হল। এরপর বোয়ালের টুকরোগুলিতে নুন-হলুদ মাখিয়ে রাখা হল। কালোসরষে শিলে একবাটায় পেষা হল(শিল না থাকলে মিক্সিতে গুড়ো করা), আদা বেটে নেওয়া হল। এবার ওভেনে কড়া বসিয়ে তাতে পরিমাণ মাফিক সরষের তেল দেওয়া হল। তেল গরম হলে মেথি-শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দেওয়া হল। এবার একহাতে সরষেগুঁড়ো ও অন্য হাতে মাছ নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। ফোড়ন চিড়বিড় শব্দ করে উঠলে একহাতের সরষে কড়াইতে দিয়েই অন্য হাতের মাছ ছাড়তে থাকতে হবে। ভালো করে নেড়েচেড়ে সবজিগুলি তাতে ছেড়ে দেওয়া হল। নুন দেওয়া হল। সব উপকরণ একত্রিত করে নেড়েচেড়ে সামান্য জল দেওয়া হল। হলুদ, ঝালের গুঁড়ো, কাঁচালঙ্কা দেওয়া হল। ফুটে উঠলে আদাবাটা ময়দার সাথে জলে গুলে ঝোলে ঢেলে দেওয়া হল। ভালো করে নেড়েচেড়ে মাখো মাখো করে নামানো হল। দুর্গা পূজার নবমী তিথিতে এই পদ ভোগে দেওয়ার চল ছিল।

কইমাছের মৌরিবাটা

উপকরণ- বড়ো মাপের কইমাছ -৪টি, পরিমাণ মাফিক সরষের তেল,

কালোজিরে-শুকনোলঙ্কা (ফোড়ন হিসাবে ব্যবহৃত), শিলে মিহি করে বাটা মৌরি - ৫০ গ্রাম, হলুদ-২টেবিল চামচ,লঙ্কা-১/২ চা চামচ, গোটা কাঁচালঙ্কা-৪টি, গোবিন্দভোগ চাল বাটা-আন্দাজমতো (মাছে মাখানো ও ঝোলে গুলে দেওয়ার জন্য), লবণ-স্বাদমতন।

প্রণালী- প্রথমে কইমাছগুলিকে হলুদ-নুন, কাঁচাতেল এবং অল্প একটু গোবিন্দভোগ চালবাটা মাখিয়ে রাখতে হবে। এরপর ওভেনে কড়া বসিয়ে তাতে সরষের তেল দিতে হবে। তেল গরম হলে তাতে কালোজিরে –শুকনোলঙ্কা ফোড়ন দিয়ে কইমাছ ছেড়ে দিতে হবে। এপিঠ ওপিঠ করে সাবধানে ভাজতে হবে। মনে রাখতে হবে যাতে বেশি ভাজা না হয়। এবার কড়াইতে সামান্য জল ঢেলে হলুদ-নুন-লঙ্কা দিতে হবে। তারপর কাঁচালঙ্কাগুলো দিতে হবে। নাড়াচাড়া করার ফলে জল একটু শুকিয়ে এলে মৌরিবাটার সঙ্গে গোবিন্দভোগ চালবাটা মিশিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিতে হবে। কিছুক্ষণ পর ঝোল ফুটে উঠলে বেশ ঘন ঘন করে নামিয়ে নিতে হবে।

এটি বাংলাদেশের পাবনা জেলার পুরাতন পদ। এখন লুপ্ত প্রায়। কইয়ের সাথে শিলনোড়ায় পেষা মৌরি ...এক অনাদি অকৃত্রিম রসায়ন যা খাদ্যরসিকের রসনা তৃপ্তির অমৃত।

আনারসিয়া-

উপকরণ- আনারস-১টি, চিনি-১ মাঝারি মাপের কাপ, কিসমিস-১০গ্রাম, ভিনিগার-২ চামচ, মিল্কপাউডার-৪চা চামচ, নুন-১ চিমটে, কাজুবাদাম গোটাকতক

প্রণালী- প্রথমে আনারসের খোসা ছাড়িয়ে ভিনিগার দিয়ে সিদ্ধ করুন। সিদ্ধ হলে আনারসের জল ঝরিয়ে ১/২ কাপ চিনি তাতে মাখিয়ে ১০ মিনিট রেখে দিন। মিল্কপাউডার জলে গুলে নিন। ওভেনে কড়াই বসিয়ে তাতে আনারস দিয়ে একটু নেড়ে চেড়ে মিল্কপাউডার দিন। বাকি ১/২ কাপ চিনি, নুন, কিসমিস দিন। সামান্য জল দিয়ে ভালো করে নাড়তে থাকুন। বেশ ঘন হয়ে এলে নামিয়ে নিন। কাজু ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

মায়ালু মাধুর্য্য

উপকরণ-আলু-২৫০গ্রাম,খোয়াক্ষীর-১০০গ্রাম,ছানা-১৫০গ্রাম,চিনি-২৫০গ্রাম,পেস্তা-২৫গ্রাম,দুধ-১কিলো,খোয়াক্ষীরের গুঁড়ো-১/২ মাঝারি কাপ,গোলাপজল-১চা চামচ

প্রণালী- আলু প্রথমে সিদ্ধ করে খোসা ছাড়িয়ে খোয়াক্ষীর, ছানা, চিনি সহযোগে মেখে আধঘন্টা রাখতে হবে। আধঘন্টা পর প্যানে অল্প দুধে আলুর মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। ওই মিশ্রণ হাওয়ায় ঠান্ডা করার জন্য রেখে দিতে হবে। এবার দুধ জ্বাল দিতে দিতে যতটা পরিমাণ তার অর্ধেক করে ফেলতে হবে। ওই মিশ্রণকে এবার গোল গোল আকৃতি করে গড়ে নিতে হবে। তার উপর ঐ ঘন দুধের ক্রিম ঢেলে দিতে হবে। এবার খোয়াক্ষীর ছড়িয়ে ও পেস্তা দিলেই প্রস্তুত ঘরোয়া ডেসার্ট।

কিছু কথা- রাজশাহী জেলার সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলিতে এই পদ প্রচলিত ছিল। বিজয়া দশমীর অতিথি আপ্যায়নে এই পদ ছিল সেরা। সেই পুরানো ছাঁচেই নতুনত্বের আভা মিশিয়ে আমার নিবেদন এই ১০০%ঘরোয়া ডেসার্ট। ■

আরো কিছুদিন

শঙ্কর বসু

এমনই চলুক আরো কিছুদিন
আলোয় ঢাকা থাক ধর্মযুদ্ধের প্রস্তুতি
থমকে থাকা বেলায় শানানো হোক
কন্যাভ্রূণ খালাশ করার হাতিয়ার
আরো কিছুদিন চলুক মুক্তচিন্তার শব্দছক
গণতন্ত্রের শ্বাসরোধের অপেক্ষায়।

এখনই সঠিক সময় নয়
দুহাত এখনই মুষ্টিবদ্ধ হয়নি
এখনো চাইবার কথা ভোলেনি মানুষ
বৃহত্তর মানুষ, খোদা, ভগবান
আরো কিছুদিন এমনই থাকবে
তীব্র দারিদ্র আর অনাহার ধীরে ধীরে
ওদের দুর্বল আর শান্ত করবে
বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

পৃথিবীর সব কিছু পুড়ে যাবে না
আপাতত এমন কোনও আভাস মেলেনি
শুধু ইতিউতি জ্বলে উঠছে আলো
মাংস পোড়ার গন্ধে গলিতে ভারী হচ্ছে বাতাস
কিশোরীর ছিন্ন শরীর পুষ্ট করছে
বকো হারেম, খাপ পঞ্চায়েত, কামদুনি
বিপুল জনসংখ্যার নিরিখে বেশী কিছু নয়
এখনো খারাপ কিছুই হয়নি প্রায়
সব মানুষই এখনো
মারণাস্ত্র হয়ে ওঠেনি।

শব্দহারা

- দুহিতা সেনগুপ্ত

বায়না ধরল, মন খারাপের মেঘ,
ক্যালেন্ডারের কালোর মতো
বেরসিক এক পাতার সাদায়
দাগ কাটল, মুখচোরা আবেগ।

ঝুল ধরলে, মনের কোণে ---
কোন্ অবকাশ রুটিন গোনে?
কোন্ রোববার, বাজার ফেরত
হিসাব করে ভুল?
রুমাল বাড়ায় গীতবিতান,
ভেজায় নজরুল।

হিজিবিজির কাব্য শুনে,
জলচৌকি বিপদ গুনে
যেই লুকিয়ে হাসে ---
জয়ঢাক নিয়ে আবার রবি
ক্লান্ত মহাকাশে ---

আবছা নয়, ঝাপসা ভালো,
শারদ প্রাতে রাত পোহালো,
আমার বাধায় তোমার আলো
ধরল সেই তান ---

"বিষাদে হয়ে ম্রিয়মান,
বন্ধ না করিও গান ---
সফল করি তোলো প্রাণ
টুটিয়া মোহকারা" ---

আবারও তোমার শব্দজালে,
আমার আমি হারা।।

নববর্ষ

- শান্তনু চক্রবর্তী

এই পৃথিবী খাচ্ছে যে পাক, সূর্যের চার ধারে
নববর্ষ আসবে ঠিকই বছর বছর ধরে,
প্রশ্ন জাগে, নববর্ষ, হলোটা তবে কার?
সর্বংসহা পৃথিবীটার, না কি শুধুই তোমার আমার!

তত্বকথা ভুলে বরং, দেখি এবার ফিরে
নববর্ষের মানেটা কি, এত বছর ধরে,
নববর্ষ মানে জানি বড়দেরকে প্রণাম
আগ্রহটা পয়সা পাওয়ায়, দেখছি পরিমাণ।

বছর বছর বাড়ছে দেখি যা ছিল শুধুই দশ,
আজ তা গেছে পাঁচ শততে, তবু মন মানে না বশ
হাজার হাজার টাকার চেয়ে, ঐ পাঁচ শতটা দামী
গুছিয়ে সেটা সরিয়ে রাখি, খোশ মেজাজে আমি।

নববর্ষ মানে হোল সাঁঝে হালখাতাতে যাওয়া
কালেণ্ডার আর মিষ্টি প্যাকেট, ভুরি ভুরি পাওয়া
নববর্ষ মানে বুঝি লোকের কোলাকুলি
একটি দিনে পুরনো সব, রাগ অভিমান ভুলি।

নববর্ষ মানেই কিছু নতুন প্রতিশ্রুতি,
সিগারেটটা ছাড়তে আমার নেইতো কোনও ক্ষতি,
নববর্ষ মানেই প্রচুর ভালো কথা ভাবা
বছর নাকি যাবেই এমন, বোকা, না কি হাবা!

আমার কাছে নববর্ষ, একটি মাইল ফলক
একটি বছর কাটল আরো, রাখলাম কি ঝলক?
কেমন করে আগামী দিনে আরো শ্রীবৃদ্ধি করি
বিপদ বাধা সরতে থাকুক, যে পথ আমি ধরি।

নববর্ষ জোগায় যে বল, শেখায় ভালবাসা
সব দুঃখ ছাপিয়ে গিয়ে, মনে জাগায় আশা,
সব কালিমা থাক না দূরে, একটি দিনের তরে
হোক না শুরু যাত্রা আবার নতুন দিনের ভোরে।।

তুমি সূর্য

- নমিতা চন্দ

মেঘের চাদর গায়ে দিয়ে
আকাশের জানালা খুলে
তোমার আলোয় ভরিয়ে দিলে বিশ্ব,
তুমি সূর্য।

সেই আলোতে ছুটছে সবাই
নিজের নিজের কাজে
উদ্দেশ্য সফল হবে
এটাই মনে রেখে
তুমি সূর্য।

নীল সাগরের গায়ে
তুষার শৃঙ্গের পরে
উঠছো হেসে প্রভাতে
তুমি সূর্য।

দিনের শেষে লুকিয়ে গেলে
সন্ধ্যা তারার মাঝে
স্নিগ্ধ চাঁদের মাঝে
সেই আলোয় ভরিয়ে দিলে বিশ্ব
তুমি সূর্য।

মেঘের চাদর গায়ে দিয়ে
আকাশের ওই জানালা খুলে
আবার তুমি হাসবে
তুমি সূর্য।।

আরশি

- সুব্রত বনিক

ওগো আরশি,
বলতো দেখি আমায় দেখে,
কিছু ভুল পড়ে কি ধরা,
তোমার ওই স্বচ্ছ চোখে?
যা করেছি
তা সবই কি ঠিক,
করিনি কি বেনিয়ম
কখনও না মেনে দিক?
কী কী ভুল
করেছি আমি সারা জীবন,
যা এখন শুধরাতে চায়
আমার এ অশান্ত মন?
না যদি বল
কোনটা যে আমার ছিল ভুল,
তবে যে দিতে হবে
সারা জীবন ভুলের মাশুল।
যদি তুমি না বলো
তবে ভুলের বোঝা বেড়েই যাবে,
এত ভুলের পরে
কাছে মোর কেইবা রবে?
ভুলের বোঝা আমি
আর তো বাড়াতে নারাজ
সঠিক পথের দিশা
মোরে দেখাও তুমি আজ।
ভুল করেও আমি
আর যেন না ভুল করি
আজ অতীত ভুলের জ্বালায়
গুমরে গুমরে মরি।
সকলে যেন তোমাতে
একবার নিজেরে চেয়ে দেখে
শুধরে নিজের ভুল
সঠিক দিশায় চলতে শেখে।
দিনের শেষে একবার
নিজেরে আরশিতে মেলে
শুধরে ভুল, সঠিক পথে
এগিয়ে যাবে হেসে খেলে।।

মানবিকতার মৃত্যু

- বিশ্বনাথ পাল

মানবিকতা -- আজকে তোমার ছুটি
দেখো – আমার জগত কেমন শান্তিময়
জানি সন্ত্রাসে মরছে লক্ষ কোটি
তা এমনটা তো সব সময়ই হয়।

মানবিকতা – আজকে ঘুমাও তুমি
বড্ড বেশি করছ জ্বালাতন
তৃতীয় বিশ্ব আমার জন্মভূমি
সে কথা আজ ভুলতে চায় যে মন।

মানবিকতা – আজ তোমার নেই তো দাম
ব্যবসায় তুমি হয়ে গেছ হেরে ভূত
আমার যে চাই অনেক নাম ইনাম
তোমার কথা লাগে বড় অদ্ভুত।

মানবিকতা – কোথায় জন্ম তোমার?
শুনেছি কোনো পৃথিবী নামের গ্রহে
কিন্তু সেখানে মানুষ নেই যে আর
তবুও তুমি ঘুরছো কিসের মোহে?

আজকে তুমি দেখো না জগত জুড়ে
সভ্যতার কেমন অগ্রগতি
তোমাকে সবাই ছুড়েছে আস্তাকুঁড়ে
কাম্য নয় তো তোমার উপস্থিতি।

কিছু ভূখণ্ড রক্তে হয়েছে লাল
কিছু ভূখণ্ডে চলছে চির আকাল
তবুও এসব মনকে দেয় না নাড়া
মানবিকতা – মৃত আজ নেই সাড়া।।